হযরত ইউসুফ

আবুল কালাম আযাদ

হযরত ইউসুফ (আঃ)

মূল ঃ মওলানা আবুল কালাম আযাদ
অনুবাদ ঃ মওলানা আবদুল আউয়াল

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-এর পক্ষে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ই. ফা. প্রকাশনা : ১০৫

হযরত ইউসুফ (আঃ) :
মূল : মওলানা আবুল কালাম আযাদ
অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল

দ্বিতীয় প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৭৯
অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬
মুহররম, ১৪০০

প্রকাশনায় :
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-এর পক্ষে
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা-২

প্রচ্ছদ অংকনে :
কুতুব-উজ-জামান খান

মুদ্রণে :
বাংলা একাডেমী প্রেস
বর্ধমান হাউস
রমনা, ঢাকা-২

মূল্য : ১২·০০

HAZRAT YOUSUF (AM) : The Biography of the Prophet Hazrat Yousuf (Am), written by Maulana Abul Kalam Azad in Urdu, translated by Maulana Abdul Awal into Bengali and published by the Islamic Foundation, Bangladesh, Dacca, for the Islamic Cultural Centre, Chittagong. to celebrate the commencement of 1400 Al Hijra.

Price : Tk. 12·00

মুখবন্ধ

কুরআনে পাক একটি কাহিনীকে 'আহ্সানুল-কাসাস' বা সর্বোত্তম কাহিনী বলে অভিহিত করেছে। কাহিনীটি হল নবী হযরত ইউসুফের কাহিনী। এতে মানুষের জানবার ও শিখবার অনেক কিছু রয়েছে। এতে এক-দিকে ধৈর্য, সাধুতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ আর অপরদিকে হিংসা, অসাধুতা ও চরিত্রহীনতার পরিণাম দেখানো হয়েছে। কিন্তু কাহিনীটির সাথে বাংলাভাষীরা সরাসরি পরিচিত নয়। আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে কবি মোহাম্মদ সগীর পারসী 'ইউসুফ-যলেখা' কাব্য থেকে একে বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত করলেও তা ছিল অতিরঞ্জিত। কবি সাহিত্যিকরা সব বিষয়ে সাধারণতঃ যা করে থাকেন, এতেও তাই করা হয়েছে। এছাড়া সেটি এখন আমাদের পক্ষে সুবোধ্য, সুখপাঠ্যও নয়।

এ অবস্থায় তরুণ লেখক মওলানা আবদুল আউয়াল কর্তৃক মওলানা আযাদের তাহ্কীকের সাথে উরদুতে লেখা "হযরত ইউসুফ"-এর বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশকে সত্যই বাংলাভাষীদের প্রতি তাঁর একটা বড় অবদান বলতে হবে। বইখানির যতটুকু—আমি দেখেছি—অনুবাদ জড়তা-হীন ও ভাষা সাবলীল। বইখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদর লাভ করবে—এই আমার আশা।

—আহকার নূর মোহাম্মদ আযমী
২৪/১২/৬২

অনুবাদকের কথা

বিশুদ্ধ চরিত্রবলে মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম হয়, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনালেখ্য তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে আল-কুরআনের একটা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। আল-কুরআন এ'কে 'সুন্দরতম কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছে। দুঃখের বিষয়, আল-কুরআন স্বীকৃত এই মহামানব চরিত মানুষের হাতে নানা অবাস্তব রূপকথা ও কাহিনীতে রূপ লাভ করেছে। এতে করে আল-কুরআনে উদ্ধৃত হওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে বসেছে।

মনীষী মওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত 'হযরত ইউসুফ' শীর্ষক উর্দু কিতাবখানাতে আল-কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ চরিত্রের বাস্তব প্রতিচ্ছবিই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে সম্যকরূপে। রূপকথার রূপের ছাদকে ঝেড়ে ফেলে তিনি হযরত ইউসুফ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোকে পবিত্র কুরআনের আলোকে এবং ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর অনুপমরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলা বাহুল্য, 'হযরত ইউসুফ' তারই বাংলা অনুবাদ।

মওলানা আযাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা, অতলস্পর্শী ও রহস্যপূর্ণ ভাবধারার অনুবাদ দুরূহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমার দীনতম প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে, তা পাঠক মহলেরই বিচার্য।

শ্রদ্ধেয় জনাব মওলানা নূর মুহাম্মদ আয'মী সাহেব এই পুস্তকের 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়ে আমাকে যে উৎসাহিত করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর নিকট সত্যি কৃতজ্ঞ।

২৫/১২/৬২ ইং
উজানী, কুমিল্লা।

আবদুল আউয়াল

প্রকাশকের কথা

কোন মহামানবের জীবন চরিতই তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা তথা আদর্শের সঠিক ও স্বচ্ছ চিত্রটি মানুষের সামনে তুলে ধরে। তাতে করে মানুষ তাঁর জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত হয় এবং সে আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু মহামানবদের জীবন কথার সাথে সত্য ও বাস্তবের সংগতি বড় একটা দেখা যায় না। একথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সেসব বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মনীষা সম্মান, খ্যাতি ও মর্যাদার উচ্চমানে উন্নীত হন, পৃথিবী তাঁদের ইতিহাসের চেয়ে বেশী খুঁজে বেড়ায় কল্পনা ও রূপকথার রাজ্যে। আর তাই ইতিহাস-দর্শনের ভিত্তি নির্মাতা মহাত্মা ইবনে খালদুন একটা সাধারণ নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যেসব কাহিনী বা ঘটনা যতো বিখ্যাত হবে, কল্পনা ও রূপকথা তাকে ততই আপন আশ্রয়ে টেনে নিয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন কাহিনীর বেলাও তার ব্যতিক্রমটি ঘটেনি। তাঁর জীবন ছিলো সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেন নি। আর তাই পবিত্র কুরআন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন-কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' বা সর্বোত্তম কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু মানুষ আজ তাঁর জীবন কাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে রোমান্টিকতায়, রূপকথার রাজ্যে। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ লেখা হয়েছে। তাতে কার পবিত্র কুরআনের সর্বোত্তম কাহিনীটি কল্পনা প্রকৃত রূপকথায় পরিণত হয়েছে। এই কাহিনীর সত্যিকার চিত্র খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পবিত্র কুরআনের আলোকে মওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত "হযরত ইউসুফ" শীর্ষক উর্দু পুস্তকে এই মহামানবের জীবনাদর্শের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটির বাংলায় অনুবাদ করেন মওলানা আবদুল আউয়াল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন কোরান মঞ্জিল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আশা করি বাংলাভাষী পাঠক সমাজ এই বইয়ের মাধ্যমে হযরত ইউসুফের সত্যিকার জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত হবেন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উপকৃত হবেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)

॥ সূচী ॥

হযরত ইব্‌রাহীমের কবিলা

★

হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাবের প্রায় দু'হাজার বছর আগে, মিসর ছিল তৎকালীন তাহ্‌যীব তামুদ্দুনের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসবাসকারী জাতিগুলো সভ্যতা ও স্থায়ী আবাসের সহিত তখনও অপরিচিত ছিল। যাযাবর জীবন যাপন করত তারা। মিসরের কাছাকাছি একটি এলাকা পরবর্তী কালে প্যালেস্টাইন নাম ধারণ করেছে এবং সিনাই যোজক দ্বারা আফ্রিকা মহাদেশের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই এলাকার প্রায় সব প্রাচীন লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পশু চরাবার উপযোগী একটি মরু অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন বেদুঈন গোত্র বসবাস করত। হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) ক্ষুদ্র গোত্রটি ছিল এদের অন্যতম।

প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি ফোরাত ও দজলা (ইউফ্রেতীস ও তাইগ্রীস) উপকূলে (ইরাকে) হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) জন্ম হয়। সেখান থেকে হিজরত করে তিনি 'কেনানে' এসে স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসবাস করেন। কেনান বলতে প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত মরু সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত জর্দান নদীর তীরবর্তী এলাকাটুকুকেই বুঝায় এবং জর্দান নদীর পানি তাকে উর্বরা রাখত। তৌরাতে বর্ণিত আছে—হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রত্যাদেশবাণীর মাধ্যমেই এ অঞ্চলটিকে স্বীয় আবাসভূমির জন্য মনোনীত করেছিলেন। "আল্লাহ্‌ তাঁকে বলেছিলেন, "হে ইব্‌রাহীম!

তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, তার চারদিকে দৃষ্টিপাত কর। এ সমগ্র রাজ্যটি আমি তোমাকে এবং তোমার বংশধরদের দান করব। আমি তোমার বংশে বালিরাশির ন্যায় অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করব। অসংখ্য বালিরাশিকে যদি কেউ গুণে শেষ করতে পারে, তাহলে তোমার বংশধরকেও সে গুণে শেষ করতে সমর্থ হবে।"

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায়ও এ সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেনানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিকট এ ধরনের আরও সুসংবাদ আসতে লাগল। এসব সুসংবাদের সারমর্ম ছিল এই ঃ

আল্লাহ্ তাঁকে সমস্ত উম্মতের নেতা, বংশধরগণের মূল ব্যক্তি এবং সমস্ত বাদশাহ্র পূর্বে পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্যের জন্য তাঁর বংশধরদের মনোনীত করেছেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা যুলুম-অত্যাচার ও গোমরাহীর সাথে জড়িয়ে না পড়বে, ততদিন আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুত প্রাচুর্যের উত্তরাধিকারী থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্র এ সুসংবাদকে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশের প্রতি একটি "চুক্তি"বলে গণ্য করা হত ; অর্থাৎ এ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। সে বংশের প্রতিটি বিশেষ ব্যক্তিই তা রক্ষা করে চলতেন এবং মৃত্যুকালে স্বীয় উত্তরাধিকারীকে তা সংরক্ষণ করার জন্য অন্তিম অনুরোধ করে যেতেন।

দু'টি কথা এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

প্রথমত—ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধরগণ আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তাতে দীক্ষিত হওয়ার জন্য মানব জাতিকে আমন্ত্রণ জানাবে।

দ্বিতীয়ত—আল্লাহ্ তাদের প্রাচুর্য্য দান করবেন এবং আমন্ত্রণকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায়ও এ সুসংবাদগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারার ১২৫ নং এবং সূরা হূদের ১৭ নং আয়াতে দু'টি সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওরাত গ্রন্থ থেকে এটাও জানা যায়—আল্লাহ্ কোন এক সময়ে হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) একটি বিশেষ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছিলেন,—অর্থাৎ "হে ইব্রাহীম ! তোমার বংশধররা কোন এক পররাজ্যে যাবে ; সে

দেশের লোকেরা তাদেরকে নিজেদের দাস করে রাখবে এবং চারশত বৎসর পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে।

হযরত ইব্রাহীমের ঔরসে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইসমাঈল হিজাযে বসবাস করতে লাগলেন এবং হযরত ইসহাক থাকলেন কেনানে স্বীয় খান্দানের ওয়ারিস হয়ে। হযরত ইসহাকের ঔরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম হয়। হযরত ইয়াকুব স্বীয় খালাত বোনকে বিয়ে করার জন্য প্রথমত 'হানার' নামক স্হানে যান। বিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় কেনানে প্রত্যাবর্তন করে তথায় স্হায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তওরাতে উল্লেখ আছে,—তাঁর দ্বারাই আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীমের বংশের উপরিউক্ত চুক্তি বা 'আহাদ'কে সঞ্জীবিত করেছেন। পবিত্র কোরআনও এর স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্যালেস্টাইনের সমগ্র এলাকার বাসিন্দাদের ন্যায় হযরত ইয়াকুবের বংশধরদেরও ছিল বেদুঈন বা যাযাবর জীবন। পশু-চারণ এবং উহাদের মাংস, দুধ ও পশমই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়।

পক্ষান্তরে সে এলাকা হতে অনতিদূরেই বিশাল সাম্রাজ্য মিসর ভূমি তখন তাহ্যীব তামদ্দুন ও সভ্যতার দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল। মিসরের রাজধানী 'রা'মীস' ছিল তৎকালীন শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থ-ভূমি। তথাকার বাসিন্দাদের মধ্যে নাগরিক জীবন-বোধ ও ধনৈশ্বর্যের খ্যাতি পুরোমাত্রায় বিরাজমান ছিল। সুতরাং স্বভাবতই মিসরবাসীরা নিজেদের সবদিক দিয়ে সভ্য ও উন্নত মনে করত এবং আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী বেদুঈনদের ঘৃণার চোখে দেখত। বিশেষ করে কেনান ও ইব্রানবাসীরা ছিল তাদের চোখে অত্যন্ত হীন ও ঘৃণ্য। মিসরবাসীরা তাদের 'রাখাল' বলে সম্বোধন করত এবং নিজেদের সভাসমিতি ও মেলা-মজলীসে তাদের সম আসনে বসার অযোগ্য বলে মনে করত। কোন মিসরীয় তাদের সাথে একস্হানে বসে কোন কিছু খাওয়া-দাওয়া করত না, এমনকি গ্রাম্য মিসরীয়দের নিকটও তারা ছিল চরম ঘৃণার পাত্র। কোন ইব্রানী বা কেনানীর মিসরীয়দের আবাদী এলাকায় এসে বাস করাটাও ছিল তাদের কাছে অসহনীয়।

আল্লাহ্‌র কুদরতের মহিমা

★

আল্লাহ্‌র কুদরতে এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল ; কেনানের সেই বেদুঈন কাবিলার অল্পবয়স্ক একটি ছেলে নিজ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অগোচরেই মিসরে গিয়ে পেঁছিল এবং কিছু কাল পরেই বিশ্ববাসী দেখতে পেল, বিশাল সাম্রাজ্য মিসরের সর্বময় কর্তৃত্ব সেই কেনানবাসীর হাতেই এসে পড়েছে। তৎকালীন সম্রাট হ'তে আরম্ভ করে মিসরের সাধারণ প্রজারা পর্যন্ত তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে হল মস্তকাবনত।

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ! তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী, সভ্যতাসমৃদ্ধ ও গর্বস্ফীত রাষ্ট্রের সিংহাসন হঠাৎ কে এসে অলংকৃত করল ? সেই বেদুঈন কাবিলার একজন রাখাল, যাদের সভ্যতার তীর্থভূমি মিসরের প্রতিটি নাগরিকই অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতে আদৌ ইতস্তত করত না।

এ আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ঘটনাটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল আসল থেকে আরো বিস্ময়কর।

হযরত ইয়াকুবের (আঃ) বারজন সন্তান ছিল। রোবেন, শামউন, লাওয়া, ইয়াহুদা, আশকার ও যেবুলুন নামক ছয়জন ছিল তাঁর লিয়াহ্ নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত ; ওয়ান ও নাফতালী নামক দু'জন ছিল বালহার গর্ভজাত। জাদ ও আশের ছিল যোলফার গর্ভজাত। ইউসুফ ও বেনইয়ামীন ছিলেন রাখেল নাম্নী স্ত্রী হ'তে। ইউসুফ ও বেনইয়ামীন সকলের ছোট ছিলেন এবং বেনইয়ামীনের জন্মের পরই তাঁদের মাতা রাখেল

ইহলোক ত্যাগ করেন।

এরপর বার ছেলে, পিতা ও তাঁর এক স্ত্রী সর্বমোট চৌদ্দজন পরিবারে অবশিষ্ট রইলেন।

তওরাত গ্রন্থে আছে, হযরত ইয়াকুবের স্ত্রী লিয়াহ্ ও রাখেলের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল এবং ইহা তাঁদের ছেলেদের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত হয়েছিল।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় সন্তানদের মধ্যে ইউসুফকে সর্বাধিক স্নেহ করতেন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের চোখের সম্মুখে রাখতে চাইতেন। পক্ষান্তরে এটা ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। এজন্যই হযরত ইয়াকুব ইউসুফের স্বপ্নকে তাঁর অন্যান্য ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

(ইউসুফ তাঁর পিতার নিকট বলেছিলেন, "আব্বা! আমি স্বপ্নে দেখেছি চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজ্দা করছে।" (সূরা ইউসুফ, ৪র্থ আয়াত।)

তওরাত গ্রন্থে আছে, "ইউসুফ সতর বৎসর বয়সে উক্ত স্বপ্নটি দেখেছিলেন। এগারটি তারকা দ্বারা তাঁর একাদশ ভ্রাতাকে বুঝান হয়েছিল এবং চন্দ্র-সূর্য দ্বারা বুঝান হয়েছিল তাঁর বিমাতা ও পিতাকে।" উক্ত গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে, হযরত ইউসুফ এ রহস্যপূর্ণ স্বপ্নটি তাঁর ভাইদের নিকট প্রকাশ করে ফেলেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যা যে কি তাও তারা বুঝে গিয়েছিল। সম্ভবত পিতার নিষেধাজ্ঞার পূর্বেই হযরত ইউসুফ তা ভ্রাতাদের নিকট প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

ইউসুফের ভ্রাতারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগল ঃ "পিতার নিকট ইউসুফ ও তাঁর সহোদর (বেনইয়ামীন) অধিক প্রিয়। অথচ আমরা পূর্ণ একটি দল (অর্থাৎ সংখ্যায় আমরা তাদের থেকে অধিক)। নিশ্চয় তিনি স্পষ্টত ভ্রমে পড়ে আছেন। সুতরাং ইউসুফকে মেরে ফেলব অথবা দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে রেখে আসব, তাহলে পিতার স্নেহ-দৃষ্টি আমাদের উপরই পড়বে। সে বের হয়ে গেলে পর আমাদের সকল মতলব সিদ্ধ হবে।" (সূরা ইউসুফ ৮—৯)

তওরাতে বলা হয়েছে, হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা এ পরামর্শ করলে

তাদের এক ভাই 'রোবুন' বলল,—"তাকে হত্যা করো না বরং কোনও কূপে নিক্ষেপ করে এসো"।

হযরত ইউসুফকে ধ্বংস করার নিমিত্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা রাজপথ হ'তে কিছু দূরে একটি শুকনো কূপে তাঁকে ফেলে দিয়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেখানে কেউই যাবে না (অর্থাৎ ইউসুফের আর পৃথিবীর মুখ দেখার সৌভাগ্য হবে না)। কিন্তু দৈবক্রমে কোন একটি কাফেলা পথভ্রষ্ট হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং পানির জন্য উক্ত কূপে বালতি ফেলে। তা দেখে ইউসুফ মনে করলেন, আমার প্রতি ভাইদের বোধহয় করুণা সঞ্চার হয়েছে, তাই আমাকে উঠাবার জন্য এখন তারা বালতি ফেলেছেন। সুতরাং তিনি তাতে বসে পড়েন। এইভাবেই তিনি এ বিপদ হতে মুক্তি পান।

হযরত ইউসুফ সাময়িক বিপদ হতে মুক্তি পেলেন বটে ; কিন্তু সাথে সাথেই তিনি এমন একটি বিপদের সম্মুখীন হলেন—যা আজীবন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অর্থাৎ কূপ হতে উঠানোর পর ইউসুফের ভ্রাতারা তাঁকে পলাতক কৃতদাস বলে কাফেলার নিকট বিক্রি করে দেয় এবং তারা অন্য কোন ক্রেতার নিকট বিক্রি করার জন্য মিসরে নিয়ে আসে।

এমনি করে কৃতদাসের বেশে ইউসুফ মিসরে প্রবেশ করেন। তাও কিরূপ দাস ? —যাকে অতি অল্প পয়সার বিনিময়ে কেনা হয়েছিল এবং মিসরে নিয়ে আসার পরও অতি অল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল। বিক্রেতাদের তাঁর মূল্য বাড়াবার তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। এমন কি মিসরের দাস 'মার্কেটে'ও তাঁর মূল্য বৃদ্ধির বিশেষ কোন প্রস্তুতি ছিল না।

যা'হোক অবশেষে তাঁর প্রতি এক খরিদ্দারের দৃষ্টি পড়ায় তিনি তাঁকে খরিদ করেন। হযরত ইউসুফ প্রথমে স্বীয় মনিবালয়ে একজন সাধারণ নতুন ক্রীতদাস হিসাবে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতা, সচ্চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা পরে একজন প্রভু ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদায় উন্নীত হন।

তওরাতে আছে, উক্ত ক্রেতার নাম ছিল 'ফুতিকার'। তিনি তৎকালীন বাদশাহ্ ফেরাউনের সেনাপতি ছিলেন। কোরআনেও তাঁকে 'আযীয' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত।

আযীয তো প্রথমে তাঁকে একটি সুশ্রী গোলাম হিসেবেই কিনে আনলেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর নিকট হযরত ইউসুফের গুণাবলী প্রকাশ পেল। তিনি তাঁর সততা, সাধুতা ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বীয় ঘর বাড়ী ও আধিপত্য এলাকার সর্বময় কর্তা করে দিলেন।

তাওরাত গ্রন্থে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফের সুষ্ঠু পরিচালনায় ফুতিকারের আয় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

এখান থেকেই মিসরে হযরত ইউসুফের সফলতার ভিত্তি পত্তন হয়। তখন হতে এমন এক ক্ষেত্র গড়ে ওঠে—যেখানে তাঁর সর্বপ্রকার নিপুণতার বিকাশ হয় এবং তা একদিন তাঁকে মিসরের সিংহাসনে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ বলেন, وكذلك مكنا ليوسف فى الارض—"এভাবেই আমি ইউসুফকে মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছি।" যিনি একদিন দাসরূপে বিক্রি হয়েছিলেন, তিনিই পরে সম্মান ও মর্যাদায় বিভূষিত হয়েছিলেন। (আরো বলা হয়েছে : والله غالب على امره—লক্ষ্য করুন ! আল্লাহ্ স্বীয় অভিলাষ কিরূপে বাস্তবায়িত করেন। ভ্রাতারা তাঁকে নিরাশ করতে চেয়েছিল, অথচ তাঁরা যা করেছিল সেটাই তাঁর সফলতা বা কামিয়াবির উপায় হয়ে দাঁড়াল।

হযরত ইউসুফ সতেরো বৎসর বয়ঃক্রমকালে আল্লাহ্র মহিমায় পিতার স্নেহ-ক্রোড় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তওরাতের এ বর্ণনাটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরায়ে ইউসুফের ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি আযীযের নিকট কয়েক বৎসর অতিবাহিত করার পর যৌবনে পদার্পণ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেন। বাস্তবে এরূপই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান—যাঁরা ভাল কাজ করেন এরূপেই তিনি তাঁদের সৎকাজের পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

———

★

সূরা ইউসুফের ২৩—৩২ আয়াত ঃ

ইউসুফ যে রমণীর (আযীযের স্ত্রীর) গৃহে অবস্থান করছিলেন সে রমণী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো এবং তাঁকে অসৎ কাজের জন্য ফুসলাতে শুরু করল, যাতে নিরুপায় হয়ে তিনি তার কথা মানতে বাধ্য হন। স্ত্রীলোকটি একদিন গৃহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে ইউসুফকে বলল, 'এস'। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন ; (এরূপ কাজ আমা দ্বারা সম্ভব নয়) তোমার স্বামী হচ্ছে আমার প্রভু। অতি সম্মানের সাথে তিনি আমাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছেন। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা আমি আদৌ করতে পারব না এবং সীমা লঙ্ঘনকারীরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না।'

বস্তুত সে মহিলাটিই ইউসুফকে ভোগ করার প্রবল ইচ্ছায় বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। এবং (পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পেঁছিল যে,) যদি ইউসুফের সম্মুখে স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন বিকশিত না হত, (তবে নিরুপায় হয়ে,) তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন! এমনি করে মানবীয় আত্মার চরম প্রলোভনপূর্ণ পরীক্ষাতেও সত্য নিদর্শন দ্বারা আমি তাঁকে সতর্ক রেখেছি যাতে তিনি কুৎসিৎ ও লজ্জাহীন পাপানুষ্ঠান হতে দূরে থাকেন। নিঃসন্দেহ তিনি আমার মনোনীত ব্যক্তিদেরই অন্যতম ছিলেন।

অতঃপর উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো। ইউসুফ (সে মহিলাটির কামোম্মাদনা হতে আত্মরক্ষার জন্যই বেরিয়ে যেতে দরজার দিকে দৌড়াচ্ছিলেন আর মহিলাটি দৌড়াচ্ছিল তাঁকে রুখবার জন্য)। মহিলাটি ইউসুফের জামার পিছন দিক দিয়ে টেনে ধরল এবং উহা দু'খণ্ড করে ফেলল।

তারপর হঠাৎ উভয়েই দেখতে পেল, মহিলার স্বামী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। মহিলাটি (স্বীয় অপরাধ চাপা দেয়ার জন্য চিরাচরিত নারী-স্বভাবসুলভ মিথ্যে বানিয়ে) বলল, 'যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে অসৎ কর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি, তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা অন্য কোনও কষ্টদায়ক কঠোর শাস্তি প্রদান করা ছাড়া আর কি হতে পারে?'

অতঃপর ইউসুফ বললেন, "তিনিই আপন কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ডেকেছিলেন; স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করার উদ্দেশে আমাকে ষড়যন্ত্র করছিলেন—যাতে আমি তার এ ফুসলানিতে পড়ে যাই।" (আমি কক্ষণো এরূপ করিনি।)

ইত্যবসরে সে মহিলার পরিবারেরই একজন সাক্ষ্য দিয়ে বলল,—'যদি ইউসুফের জামা সম্মুখ দিয়ে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলা সত্যবাদিনী আর ইউসুফ মিথ্যাবাদী। আর যদি পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী আর ইউসুফ হচ্ছে সত্যবাদী।'

মহিলার স্বামী ইউসুফের জামা পিছন দিক দিয়ে ছেঁড়া দেখতে পেয়ে (মূল ব্যাপারটি বুঝে ফেললেন) স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিঃসন্দেহে ইহা তোমাদের (স্ত্রীলোকদের) চক্রান্তেরই একটি দৃষ্টান্ত এবং তোমাদের প্রবঞ্চনা অতিশয় ভয়ানক।'

অতঃপর তিনি ইউসুফকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে ইউসুফ! ইহা ভুলে যাও। (অর্থাৎ যা হবার হয়ে গেছে—এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করো না এবং এ বিষয়ে মনে কোন কষ্ট রেখ না।) স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, "নিঃসন্দেহে তুমিই অপরাধিনী। স্বীয় পাপ মার্জনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

এরপর (যখন ঘটনা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে) শহরের মহিলারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, '(শুনেছ)! আযীযের স্ত্রী স্বীয় বাসনা চরিতার্থ

করার জন্য আপন ভৃত্যকে ফুসলাচ্ছে। সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে। আমরা তো তাকে স্পষ্ট বিপথগামিনী দেখতে পাচ্ছি।'

আযীযের স্ত্রী এসব কুৎসা রটানোর খবর শুনতে পেয়ে ওসব মহিলাকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের বসার জন্য ভাল ভাল সুসজ্জিত আসনের ব্যবস্থা করল। (তৎকালীন প্রথানুসারে) প্রত্যেক মহিলাকে এক একটি ছুরি প্রদান করল যাতে খাওয়ার সময় কাজে আসে। (এসব ব্যবস্থা সমাপন করার পর) ইউসুফকে বলল, 'এদের সম্মুখে এস।' ইউসুফ তাদের সম্মুখে আসলে পর দেখা মাত্র সকলেই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। সবাই নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল এবং বলে উঠলো : সুব্হানাল্লাহ্ ! এতো মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন মহান ফেরেশ্তা।

অতঃপর (আযীযের স্ত্রী) বলল, 'তোমরা দেখলে তো ? এ' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে দোষারোপ করে থাক। বাস্তবিকই আমি তার থেকে আপন কামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে পবিত্র ও নির্দোষ রইল। এখন আমি (তাকে শুনিয়ে) বলছি, সে যদি আমার কথা না মানে (এবং নিজ দাবীর উপর অটল থাকে), তবে নিশ্চয়ই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।'

তওরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইউসুফ অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর চেহারাও ছিল জ্যোতির্ময়। কৈশোর পেরিয়ে তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, আযীযের স্ত্রী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু ইউসুফের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর প্রেমের চিরা-চরিত প্রথানুযায়ী মেয়েলোকটি তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ ছল চাতুরীর আশ্রয় নিল। এতসব করেও যখন দেখা গেল ইউসুফ কিছুতেই তার কামাতুর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না, তখন একদিন সে স্বীয় কামনায় উন্মত্ত হয়ে চাওয়া-পাওয়ার শেষ ব্যাপারটি ঘটিয়ে বসল, অর্থাৎ লাজ লজ্জা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও লোকভয়কে উপেক্ষা করে সে খোলাখুলিই তাঁকে ধরে বসল।

এ ঘটনার বাস্তবতা উৎঘাটনের পন্থা নির্দেশককে কোরআনে 'শাহেদ' (সাক্ষী) বলা হয়েছে। কেননা, সে ব্যক্তি জামা ছেঁড়া দেখেই ব্যাপারটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল এবং সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, ইউসুফ এ

ব্যাপারে একেবারে নির্দোষ ; সে তার বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে আযীযকে বলেছিল : ইউসুফের জামার যে কি অবস্থা তুমি নিজেই তা দেখে ন্যাও।

এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ সাক্ষ্য প্রদানকারী লোকটি ছিল কে?—এ সম্বন্ধে কোরআনে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, লোকটি ছিল মহিলার স্বজনদের একজন। কোরআনে এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলা হয়নি। কেননা ইহা কোরআনের প্রধান উদ্দেশ্য নয় আদৌ। এখানে এ কথাটি তুলে ধরার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইউসুফের নির্মল চরিত্র ও পবিত্রতায় পরিবারের সকলেই যে তাঁর প্রতি আস্থাবান এবং সকলেই যে তাঁকে চরিত্রবান বলে মনে করত তারই প্রমাণ করা। এমনকি উক্ত মেয়ে লোকটির একজন নিকট আত্মীয়, স্বীয় আত্মীয়তা উপেক্ষা করে হযরত ইউসুফের স্বপক্ষে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেছিল।

শহরের সমশ্রেণীর মহিলা সমাজে ব্যাপারটি ছড়িয়ে
পড়া,—তাদের নানারূপ কুৎসা রটানো ও বিদ্রূপ
উক্তি শুনে আযীযের স্ত্রী তাদেরকে নিমন্ত্রণ দেয়া
ও মহফিলের এন্তেযাম করা,—এ অগ্নি
পরীক্ষায়ও হযরত ইউসুফের পবিত্রতা
ও নির্মলতা রক্ষা।

ত্রিংশতি আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও পূর্ববর্তী বর্ণনা হতে অতি সুন্দর ও আধুনিক রূপে হযরত ইউসুফের নির্মল বর্ণনা দে'য়া হয়েছে।

কোরআনের বর্ণনার মাধ্যমে এটাও জানা গেল যে, সেকালে মিসরের সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ উন্নত ছিল। মিসরের তৎকালীন সমাজেও নিমন্ত্রণ মজলিসাদি বিশেষরূপে সাজান গোছান হত। বসার জন্য আসনাদির ব্যবস্থা করা হত। খাওয়ার সময় প্রত্যেকের সম্মুখে ছুরি রাখা হত। আসনাদির ব্যবস্থাপনার কথা তো এ আয়াতটি হতেই জানা গেল : واعتدت لهن متكا —তাদের জন্য আসনাদির ব্যবস্থা করা হল।

মিসরের তৎকালীন সমাজ যে বেশ উন্নত ও সুসভ্য ছিল, প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতিতেও আমরা তার স্বীকৃতি পাই। বিশেষ করে কতকগুলো চিত্র থেকে সেকালের আমীর ওমরাহদের

মজলিসের রূপ দেখা যায় এবং তাতে পবিত্র কোরআনের এই সব ইঙ্গিতের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

হযরত ইউসুফের প্রতি আযীযের স্ত্রীর হুমকী : যদি আমার কথা না মান, তবে কারাবরণ করতে হবে। হযরত ইউসুফের কারাবরণকে পাপ কর্মের চাইতে অগ্রাধিকার দান এবং কারাগারে গিয়েও তাঁর সত্যে—প্রচার হ'তে বিরত না হওয়া।

আযীযের নিকট হযরত ইউসুফের সততা ও চারিত্রিক নির্মলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রেম ও কামনা বাসনা হযরত ইউসুফের প্রতি ছিল অসাধারণ। সাময়িক ব্যর্থতায় তার প্রেমাগুন এতটুকু নির্বাপিত হল না ; বরং তা যেন আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেল। সে যখন দেখল নরম সুরের আবেদন-নিবেদনে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হচ্ছে না, তখন সে কঠোর পন্থা অবলম্বন করল এবং ইউসুফকে বলল, "হয় আমার কথা মান, নতুবা অপমানজনক কারাভোগের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" উত্তরে হযরত ইউসুফ বললেন, "কারাভোগই আমার নিকট শ্রেয়, তবুও আমি সত্যতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা হতে এতটুকুন বিমুখ হতে পারবে না।"

এই ক্রীতদাসটির সম্মুখে একই সময়ে দু'টো কথা পেশ করা হয়। তার মধ্যে যে কোন একটি তাঁকে বেছে নিতে হবে। একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের সর্বাধিক আরাম আয়েশ ও সাফল্য, অন্য দিকে মানব জীবনের সবচাইতে ভাগ্যাবিতারণ ও ব্যর্থতা।

প্রথমটি ছিল ব্যক্তি জীবনের আনন্দের উৎস, কিন্তু সত্যের অপলাপ। আর দ্বিতীয়টি ছিল দৈহিক নৈরাশ্য, কিন্তু সত্যের প্রতি আনুগত্য। প্রথমটি হতে তিনি পলায়মান এবং দ্বিতীয়টি ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

তিনি প্রথমটি হতে এমন করে পালিয়ে যেতে চান, যেন তাঁর নিকট এর চেয়ে বড় আর কোন বিপদই নেই। আর দ্বিতীয়টির জন্য এরূপ আকাংক্ষা করতে লাগলেন, যেন সেটাই ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

ইহাই কোরআনের ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে : رب السجن احب الى مما يدعونني اليه —"হে প্রভু! এই স্ত্রীলোকটি আমাকে যে অন্যায়ের প্রতি আহবান করছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

মিসর ভূমিতে বিদেশী কোন একটি লোকের যত প্রকারের লাঞ্ছনা হতে পারে এবারে হযরত ইউসুফের উপর সবই এসে আপতিত হল।

প্রথমত তিনি ছিলেন ইব্রানী গোত্রীয় একজন লোক। তাও আবার কিরূপ? ক্রীতদাস! কিরূপ ক্রীতদাস—যাঁকে স্বীয় প্রভু এক জঘন্য অপরাধী পেয়েছেন এবং শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বলে ধারণা করেছেন। কিরূপ শাস্তি? কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার শাস্তি যা অপমান ও নির্যাতনের সবশ্রেষ্ঠ শাস্তি বলে গণ্য হ'ত।

এখন তিনি মিসরীয়দের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ইব্রানী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস, অপরাধী এবং সর্বোপরি একজন কয়েদী।

———

কারাগার বনাম সিংহাসন

★

সূরা ইউসুফ, ৩৫—৫৭ আয়াত,

অতঃপর (আযীযের পরিবারবর্গ) (হযরত ইউসুফের নিরাপরাধিতার) বিভিন্ন নিদর্শন অবলোকন করা সত্ত্বেও এটাই সাব্যস্ত হলো যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইউসুফকে কারাগারে রাখা হোক।

ঘটনাচক্রে ইউসুফের সাথে আরো দু'টি যুবকও কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদের একজন (ইউসুফের নিকট) বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, মদ্য তৈরির জন্য আমি আঙ্গুরের রস নিঃসরণ করছি।" অপর জন বলল, "আমি দেখেছি, মাথায় যেন আমি রুটি বহন করে রেখেছি এবং পাখীরা তা খাচ্ছে।" (তারা উভয়েই আবেদন করল,) "আপনি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আপনাকে আমরা নিতান্ত ভাল লোক দেখতে পাচ্ছি।" ইউসুফ বললেন, "(চিন্তা করো না) তোমাদের নির্দিষ্ট খাদ্য পেঁছার পূর্বেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। এটাও আমার প্রতি-পালক কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যাসমূহেরই অন্যতম। আমি সেই সব লোকের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং তারা পরকালেও বিশ্বাসী নয়। আমি স্বীয় পূর্বপুরুষ অর্থাৎ ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম মত অনুসরণ করছি। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনও কিছু শরীক করা আমাদের (ইব্‌রাহীমের বংশধরদের) পক্ষে অশোভনীয়। এ'টা আমাদের সকল মানবের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহেরই একটি বিশেষ

অনুগ্রহ বা নেয়ামত, অথচ অধিকাংশ লোকই (তাঁর এই অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! (তোমরা এ কথা নিয়ে চিন্তা করেছ কি?) পৃথক পৃথক একাধিক উপাস্য উত্তম? না আল্লাহ্—যিনি একক ও সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, তিনিই উত্তম? তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন যে সব অস্তিত্বসমূহের উপাসনা করছ, তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ কর্তৃক প্রদত্ত কতগুলো নাম ছাড়া এদের আর কি সত্যতা আছে? এগুলোর (উপাসক হওয়ার স্বপক্ষে) আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। রাজত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্রই, তাঁর আদেশ হচ্ছে—একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর, অন্য কারো নয়। এইটে হচ্ছে সত্য ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

হে উপস্থিত বন্ধুদ্বয়! (এবার তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোন) তোমাদের মধ্যে একজন, (যে স্বপ্নে দেখেছে, আঙ্গুর নিঃসরণ করছে), সে (জেল হতে মুক্তি পাবে এবং পূর্বের ন্যায়) তার প্রভুকে শরাব পান করাবে। আর দ্বিতীয় জন (যে দেখেছে তার মাথায় রুটি এবং পাখীরা তা ভক্ষণ করছে), তাকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখীরা (ঠুক্রে ঠুক্রে) তার মাথা ভক্ষণ করবে। যে কথা সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করেছ, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং এটাই হল তার শেষ সিদ্ধান্ত।

বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে হযরত ইউসুফ বুঝতে পেরেছিলেন, তাকে বললেন, "তুমি স্বীয় প্রভুর নিকট গেলে পর আমায় স্মরণ করবে।" (অর্থাৎ অবশ্যই আমার অবস্থা তোমার প্রভুর কর্ণগোচর করবে)। কিন্তু (স্বপ্নের ব্যাখ্যানুসারে মুক্তি পেলে পর) লোকটি স্বীয় প্রভুর নিকট পেঁছে হযরত ইউসুফকে স্মরণ করার কথাটি শয়তানের প্রভাবে ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত ইউসুফ কয়েক বৎসর পর্যন্ত জেলখানায় পড়ে রইলেন।

অতঃপর একদিন বাদশাহ্ সভাসদদের ডেকে বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, সাতটি মোটা-তাজা গাভী রয়েছে,—এদেরকে সাতটি কৃশকায় দুর্বল গাভী ভক্ষণ করছে এবং (আরও দেখতে পেয়েছি,) শ্যামল সাতটি (যবের) ছড়া ও সাতটি শুকনো। হে আমার সভাসদগণ! যদি স্বপ্ন-ফল বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান থাকে, তাহলে বলে দাও এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি?"

সভাসদদের সবাই (ভেবে চিন্তে) বলল, "এ হচ্ছে অশান্ত মনের কল্পনা বা মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। (ইহা বিশেষ কোন অর্থবোধক স্বপ্ন নয়।) আমরা সত্য স্বপ্নসমূহের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি, কিন্তু কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা জানি না।"

(উপরোক্ত) বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘদিন পর তার (ইউসুফের) কথা স্মরণ পড়ল। সে ইহা শুনে বলে উঠলো, "তোমরা আমাকে একস্থানে (কারাগারে) যেতে দিলে আমি তোমাদের এ স্বপ্নের ফলাফল বলে দিতে পারব।"

অতঃপর উক্ত ব্যক্তি সরাসরি জেলখানায় হযরত ইউসুফের নিকট এসে বলল, "হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতীক! আপনি আমাকে এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা বলে দিন,—সাতটি মোজা-তাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি শ্যামল ছড়া ও সাতটি শুকনো ছড়া রয়েছে। তাহলে (যারা আমাকে পাঠিয়েছে) তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারব। এতে তারা আপনার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জানতে পারবে।"

হযরত ইউসুফ বললেন, (ইহার ব্যাখ্যা ও প্রতিকার হচ্ছে এই)—তোমরা উপর্যুপরি বৎসর পর্যন্ত ফসল বপন করতে থাকবে, (এ বৎসরগুলোতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে)। তারপর (ফসল কাটার সময় পাছে যাতে পচে না যায় সেজন্য) যা কিছু কাটবে সবগুলো ছড়ার সাথেই রেখে দেবে এবং কেবলমাত্র খাওয়ার পরিমাণ কিছু পৃথক করে মাড়িয়ে নেবে।

অতঃপর সাতটি ভীষণ বিপদসঙ্কুল বৎসর আসবে, এগুলো তোমাদের সঞ্চিত শস্য সবই নিঃশেষ করে ফেলবে—কিন্ত সামান্য যা কিছু রেখে রাখবে তাই শুধু রয়ে যাবে। এরপর একটি বৎসর আসবে—সে বৎসর প্রচুর বৃষ্টি-পাত হবে এবং তাতে মানুষ (ফসল ও বীজ হতে) যথেষ্ট রস ও তৈল হবে এবং তাতে মানুষ (ফল ও বীজ হতে) যথেষ্ট রস ও তৈল নিঃসরণ করবে।

(সে ব্যক্তি এ গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন-ব্যাখ্যাটি বাদশাহের নিকট গিয়ে বললে পর) বাদশাহ্ বললেন, অতিসত্বর ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহের দূত ইউসুফের নিকট পেঁাছলে পর তিনি বলেন, (এভাবে আমি যাব না) তুমি পুনরায় তোমার প্রভুর নিকট গিয়ে (আমার

পক্ষ হতে) জিজ্ঞেস কর, কি কারণে ওসব মেয়ে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল ? (আমি চাই। প্রথমে এদের এ ধূর্তামীর ফয়সালা হয়ে যাক।) আমার প্রতিপালক তা বেশ ভাল করেই জানেন।

অতঃপর বাদশাহ্ (ওসব মহিলাদের ডেকে) বললেন, "তোমরা যখন নিজেদের কুমতলব চরিতার্থে ইউসুফকে ফুসলিয়েছিলে ; (পরিষ্কার জবাব দাও), সে সম্পর্কে আজ তোমাদের বক্তব্য কি ?" তারা বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম। আমরা তো তার মধ্যে দোষের কিছুই দেখিনি।" (ইহা শুনে) আযীযের স্ত্রীও বলে উঠলো, "যা সত্য ছিল তা-ই এখন প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমিই স্বীয় কুমতলব সিদ্ধি করার জন্য ইউসুফকে ফুসলিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে সে (নিজ বর্ণনায়) 'বিলকুল' সত্যবাদী।

ইহা আমি এজন্য বললাম, যাতে সে (হযরত ইউসুফ) জানতে পারে,— আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যাপারে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং ইহাও (যেন প্রকাশ পায়) যে, আল্লাহ্ তায়ালা কখনও বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল হতে দেন না। আমি স্বীয় আত্মার পবিত্রতা দাবী করতে চাই না। কেননা, মানুষের আত্মা তো সর্বদাই কুকাজ করার জন্য উত্তেজিত থাকে। (এর প্রভাব হতে নিরাপদে থাকা সাধারণ ব্যাপার নয়। একমাত্র মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহই এ থেকে নিরাপদে রাখে)। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক মহান ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"

অতঃপর বাদশাহ বলেন, "ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে (আমার কোন বিশেষ) কার্যে নিযুক্ত করব।" এরপর ইউসুফ বাদশাহের নিকট এলে, তিনি বললেন, "আজ তুমি আমাদের কাছে অতি মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"

ইউসুফ বললেন, "আমাকে রাজ্যের ধনাগারগুলোর পরিচালক নিযুক্ত করুন, আমি এসবের রক্ষণাবেক্ষণ করব। এ সম্পর্কে আমি বেশ ওয়াকিফহাল আছি।" (সুতরাং বাদশাহ তাঁকে রাজ্যের কর্ণধার করে দিলেন।)

লক্ষ্য কর ! এইরূপেই আমি ইউসুফকে মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—যেখানে ইচ্ছা তিনি বসবাস করতে পারেন। যাকে ইচ্ছা (এরূপেই) আমি তার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করি এবং আমি কখনও সৎকর্মীদের পারিতোষিক বিনষ্ট করি না। আর যারা (আল্লাহ্‌র প্রতি) বিশ্বাস রাখে

এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য তো পরকালের পারিতোষিক এর চাইতেও উত্তম।"

ব্যাখ্যা ঃ

তওরাত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, হযরত ইউসুফ জেলে যাওয়ার পর জেলখানার দারোগা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি সমস্ত কয়েদীদের এন্তেযাম করার দায়িত্বও তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি জেলখানার কর্তা হয়ে পড়েন এবং করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা সেখানেও তাঁকে সমস্ত কাজেই সহায়তা করেন।

প্রথমত বন্দীদ্বয় তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফের কাছে জিজ্ঞাসা করাই প্রমাণ করছে যে, জেলখানায় সবাই তাঁকে অসাধারণ জ্ঞানী ও মর্যাদাবান বলে মনে করত। দ্বিতীয়ত তাদের বাক্য—"আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি" একথাটি হতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, জেলখানায় তাঁর পবিত্রতা সর্বজনস্বীকৃত ছিল।

তওরাত গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে, বন্দীদ্বয়ের একজন বাদশাহের সুরাবাহীদের নেতা ছিল। আর অপরজন ছিল রুটি প্রস্তুতকারীদের নেতা। বাদশাহ্ কোনও ব্যাপারে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের কারাবাসের শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ প্রত্যেক কয়েদীদের অবস্থা পরিদর্শন করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, এরা বিষণ্ণ মনে বসে রয়েছে। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তারা বলল, "আজ রাতে আমরা এরূপ...স্বপ্ন দেখেছি।"

হযরত ইউসুফ কর্তৃক বন্দীদ্বয়ের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা প্রকাশ এবং তা বাস্তবায়িত হওয়া,—অতঃপর বাদশাহ্‌র এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দর্শন—তৎকালীন মিসরের সমস্ত জ্ঞানী ও যাদুকরদের তার ব্যাখ্যা দানে অক্ষমতা এবং পরিশেষে ব্যাখ্যা দানের জন্য কারাগারে থেকে হযরত ইউসুফের তলব।

তওরাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, হযরত ইউসুফ সাকীদের সরদারের স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, "তিন দিনের ভিতরই ফেরাউন তোমাকে স্বীয় কার্যে বহাল করবে এবং পূর্বের ন্যায় তুমি তার হাতে শরাবের পেয়ালা প্রদান করবে।" উপসংহারে ইহাও বলেছিলেন, "যখন তোমার অবস্থার চাকা ঘুরবে, তখন আমাকে স্মরণ রেখ—আমার সম্পর্কে ফেরাউনের নিকট বলবে যে, মানুষ আমাকে ইহুদীদের দেশ থেকে যবরদস্তি করে নিয়ে এসেছে এবং এখানেও আমাকে বিনাদোষে কারাগারে আটকে রেখেছে।" আর রুটি প্রস্তুতকারীদের সরদারকে বলেছিলেন, "তিন দিনের মধ্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তোমার দেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হবে।" বস্তুত তাই হয়েছিল। তৃতীয় দিবস ছিল ফেরাউনের জন্মদিন, সেদিন সাকীদের সরদারকে স্বীয় কার্যে বহাল করা হল এবং রুটি প্রস্তুতকারীদের সরদারের মৃত্যুদন্ড দে'য়া হল। কিন্তু সাকী সরদার হযরত ইউসুফকে স্মরণ করল না, সে তাঁর ব্যাপারটি ভুলেই গিয়েছিল।

সুতরাং হযরত ইউসুফের অবস্থার আর কোনরূপ পরিবর্তন ঘটল না। কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি জেলখানায় পড়ে রইলেন।

এরপর আসে সে ঘটনা, যে সম্পর্কে কোরআনের ৪৩ নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন মিসর অধিপতি একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন এবং তাঁর দরবারে জ্ঞানীদের কাছে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু (দরবারের) পন্ডিতদের কেউই স্বপ্নের মনঃপূত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তওরাতেও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ স্বপ্নের রহস্য জানার জন্য সমস্ত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও যাদুকরদের সমবেত করেছিলেন বটে, কিন্তু কেউই এর যথার্থ ব্যাখ্যা বলতে সক্ষম হয়নি।

দরবারীদের উত্তর সম্পর্কে কোরআনে যা উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে একথাই প্রতিভাত হয় যে, তারা স্বপ্নের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা উদ্ঘাটন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে লাগল, যাতে বাদশাহের মন হতে এর গুরুত্ব দূর করে দেয়া যায়। সুতরাং তারা বাদশাহ্কে বলল, "ইহা কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয়। আপনি দুশ্চিন্তা করার দরুন এসব স্বপ্নে দেখেছেন।" বাদশাহ্র এ স্বপ্নের কথা সাকী সরদার জানতে পেরে, তার নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি মনে পড়লো এবং এর সাথে সাথে হযরত ইউসুফ

তাকে কি বলেছিলেন তাও স্মরণ হল। অতঃপর সে তার আত্মকাহিনী বাদশাহের নিকট বিবৃত করল এবং বাদশার আদেশে কারাগারে গিয়ে হযরত ইউসুফের সাথে সাক্ষাত করল।

হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, "সাতটি গাভীর অর্থ হল ফসল উৎপাদিত সাতটি বৎসর। আগামী সাত বৎসর পর্যন্ত এদেশে প্রচুর পরিমাণে ফসলাদি উৎপন্ন হবে ; এরা যেন মোটা মোটা সাতটি গাভী। এরপর অনবরত সাত বৎসর পর্যন্ত ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে ; সাতটি কৃশকায় গাভী দ্বারা এটাই বুঝান হয়েছে। আর এরা মোটা মোটা গাভীগুলো ভক্ষণ করে ফেলেছে মানে দুর্ভিক্ষ সচ্ছলতাকে ধূলিসাৎ করে ফেলেছে। সাতটি তরু তাজা ছড়া ও সাতটি শুকনো ছড়াতেও এটাই প্রকাশ পেয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "এই আগত বিপদ হতে রাজ্যকে কি করে রক্ষা করা যাবে--তার তদবীর হচ্ছে এই, উৎপাদিত বৎসরগুলোতে দুর্ভিক্ষজনিত বৎসরগুলোর জন্য খাদ্য শস্য সঞ্চয় করে রাখবে এবং এরূপে সংরক্ষণ করে রাখবে, যাতে করে আগামী বৎসরগুলো কাটিয়ে যাওয়া যায়।"

কোরআনে হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও তার বিহিত ব্যবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয়নি, বরং একই সাথে তা করা হয়েছে ; যাতে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন না হয়। ইহা কোরআনের অতুলনীয় নিখুঁত বর্ণনা-ধারারই অন্যতম নিদর্শন।

হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা এরূপ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল যে, সাকী সরদার বাদশাহর নিকট ফিরে গিয়ে তা ব্যক্ত করা মাত্রই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তা বিশ্বাস করে ফেললেন এবং হযরত ইউসুফকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অচিরে (হযরত) ইউসুফকে কারাগার থেকে দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দে'য়া হল।

হযরত ইউসুফ কর্তৃক, মুক্তিবাণী পাওয়ার পর কারাগার বর্জনে অস্বীকৃতি এবং স্বীয় ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য বাদশাহর নিকট আপন বাণী প্রেরণ। বাদশাহর অনুসন্ধান ও হযরত ইউসুফের পবিত্রতা ও নির্দোষিতা প্রমাণ।

আযীয পত্মীর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা—সব
কসুর ছিল আমারই। ইউসুফ
সত্যবাদী।

স্বপ্ন ব্যাখ্যা শোনার পর বাদশাহর অন্তরে হযরত ইউসুফ সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা জন্মে। ফলে তাঁকে কারাগার হতে নিয়ে আসার জন্য তিনি একজন বিশেষ দূত পাঠালেন। তাকে কোরআনের ৫০ নং আয়াতে 'রসূল' শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু হযরত ইউসুফ বাদশাহর এ আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।

তিনি বলেন, "এরূপ মুক্তি আমি পছন্দ করি না। কেন আমাকে কারাবাস দেয়া হল, প্রথমে তার অনুসন্ধান করা হোক। আমি যদি সে ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হই, তাহলে আমার মুক্তি পাওয়ার অধিকার নেই। আর যদি নির্দোষ হই, তা হলে আমাকে মুক্তি দিতেই হবে।"

উক্ত বিবৃতি দান কালে হযরত ইউসুফ আযীয পত্মীর উল্লেখ না করে, যে সব মহিলারা নিমন্ত্রণ মজলিসে হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের উল্লেখ করেছেন।

তাদের উল্লেখ করার কারণ ছিল এই ঃ

(ক) হযরত ইউসুফকে কারাবাসে দে'য়ার ব্যাপারে এদের হাত ছিল। তারা স্বীয় দুর্বলতা ও ব্যর্থতার গ্লানি ধামাচাপা দে'য়ার জন্য তাঁর সম্পর্কে মিথ্যে অপবাদ সাজিয়েছিল। এই কারণেই তাদের ঘটনার পরে হযরত ইউসুফকে কারাবাসে যেতে হয়েছিল।

(খ) আহূত মহিলাদের সমীপে আযীয পত্নী স্বীকার করেছিল যে, হযরত ইউসুফ এ ব্যাপারে একেবারে নির্দোষ। বরং সে (আযীয পত্মী) স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার হাজার রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন কোরআনের ২২ নং আয়াতে এর বিবরণ দে'য়া হয়েছে। এই সব কথাই (উক্তিই) হযরত ইউসুফ চরিত্রের পবিত্রতা ও নির্মলতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে।

(গ) হযরত ইউসুফকে আহূত মহিলাদের সম্মুখে ডেকে আনার পর তাদের যে অবস্থা হয়েছিল তা থেকেই হযরত ইউসুফ সম্পর্কে আযীয-পত্মীর অভিযোগ মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি এরূপ চরিত্রবান

ছিলেন যে, শহরের সমস্ত দুর্ধর্ষ ও সুন্দরী নারীদের সম্মিলিত প্রেম প্রকাশেও তাঁকে এতটুকুও টলাতে পারেনি, কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে— স্বীয় অপমান ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা জেনে শুনেও নিজ প্রভুর স্ত্রীর উপর এরূপ হস্তক্ষেপ করবেন ?

এখানে আর একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে, যা ২৯ নং আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ; আযীয যখন বুঝতে পারল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষ তার স্ত্রীরই, সে তখন ইউসুফকে লক্ষ্য করে বলল, "ইউসুফ এ নিয়ে মাথা ঘামিও না।" অর্থাৎ যা হবার হয়ে গেছে এ সম্পর্কে কোনরূপ বলাবলি করো না। কেননা, এতে আমার দুর্নাম হবে। অবশ্য পরে আযীয তার এ উক্তিতে স্থির রয়নি এবং ইউসুফকে সে জেলে দিলে দিল। কিন্তু ইউসুফ আযীযের এ স্বী কারোক্তি ভুলে গেলেন না।

আযীয হযরত ইউসুফকে একজন গোলাম হিসেবে কিনেছিল। তারপর নিজ পরিবারের একজন বিশেষ সদস্য হিসেবে তাঁকে মান সম্মানের সাথে রেখেছিল। তিনি তার এ অনুগ্রহ ভুলতে পারেন নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আযীযের স্ত্রীর উল্লেখ করে স্বীয় অনুগ্রহকারী প্রভুর অপমানের বোঝা বাড়ানো, হযরত ইউসফের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই তিনি কেবলমাত্র হাত-কাটিয়ে মহিলাদের উল্লেখ করলেন ; প্রভুর স্ত্রীর আর উল্লেখ করলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, এদের ভেতর কেউ না কেউ সত্যতা প্রকাশ করবেই।

আযীযের পত্নী কয়েক বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল, বর্তমানে সে আর সেই পর্যায়ে নেই আদৌ। এখন সে ভালবাসার সর্বপ্রকার অপক্কতার স্তর পেরিয়ে খাঁটি প্রেমের পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছেছিল। স্বায় অপমানের ধারণায় প্রেমিকের উপর উল্টো অপবাদ চাপানো তখন তার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত মহিলা হযরত ইউসুফের পবিত্রতার স্বীকারোক্তি করলে পর, সে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলো,—"ইউসুফ নির্দোষ ও পবিত্র ; সকল দোষ ছিল আমারই।"

অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার পর, এবার হযরত ইউসুফ বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তৈরী হলেন। কেননা এখন তাঁর মুক্তি আর বাদশাহর অনুগ্রহস্বরূপ ছিল না, বরং তা ছিল এখন তাঁর ন্যায্য পাওনা।

এরপর হযরত ইউসুফের প্রতি বাদশাহর আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। তিনি ভাবলেন, যে ব্যক্তি সত্যে এইরূপ অনড়, বিশ্বাসে আর প্রতিশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান —রাষ্ট্রের কার্যাবলী আনজাম দে'য়ার জন্য তাঁর চাইতে উপযুক্ত আর কে হতে পারে ?

সুতরাং তিনি বলেলেন, "ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি তাঁকে আমার বিশেষ পদে নিয়োগ করব।" হযরত ইউসুফ তার নিকট আসলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে এরূপ অনুরক্ত হলেন যে, প্রথম সাক্ষাতেই বলে উঠলেন, "তোমার উপর আমার পূর্ণ ভরসা রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে তুমি আজ অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আগত স্বপ্নে দেখা বিপদ হতে কিরূপে রাজ্যকে রক্ষা করা যাবে, আমাকে তার বিহিত ব্যবস্হা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত কর।"

হযরত ইউসুফ বললেন, "রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার উপার্জনোপায়গুলো আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সাথে এগুলোর হেফাযত করতে পারব। (তা'হলে আগত বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে)।"

বস্তুতঃ বাদশাহ তাই করলেন এবং শাহী দরবার হতে হযরত ইউসুফ মিসর রাজ্যের একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে বেরিয়েছিলেন।

তওরাত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, বাদশাহ ফেরাউন হযরত ইউসুফের কথাবার্তা শোনার পর সভ্যসদদের করে বলেছিলেন, "এঁর ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি আমরা আর কোথায় পাব ; তাঁর মধ্যে যেন স্রষ্টার আত্মাই কথা বলছে ?" অতঃপর হযরত ইউসুফকে বললেন, "দেখ ! আমি আজ সমগ্র মিসর ভূমির কর্তৃত্ব তোমাকে দান করলাম। কেবলমাত্র সিংহাসনারোহী হিবেসে আমি তোমার উপর থাকব।" তারপর বাদশাহ স্বীয় আংটি ও স্বর্ণের হার হযরত ইউসুফকে পরিয়ে দিলেন এবং এক প্রকার সূক্ষ্ম পোশাক ও আরোহণ করার জন্য শাহী রথসমূহ হতে একটি রথ তাঁকে উপহার দিলেন। তিনি দরবার হতে বেরুবার সময় ঘোষণাকারী অগ্রে অগ্রে বলে যেতে লাগল, "সবাই শৃঙ্খলা ও আদবের সাথে স্ব স্ব স্হানে থাক" এবং বাদশাহ ফেরাউন আদেশ জারী করলেন, "আজ হতে সবাই ইউসুফকে রাষ্ট্রপতি বলে সম্বোধন করবে।"

হযরত ইউসুফের মিসরীয় জীবনে দু'বার এসেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রথমবার তিনি যখন গোলাম হিসেবে বিক্রি হয়েছিলেন এবং আযীযের দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানিত হয়ে তার এলাকার কর্ম পরিচালক হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার, যখন তিনি কারাগার হতে বেরিয়ে এলেন এবং এসেই শাসকের মহিমাময় মসনদে পূর্ণ দীপ্তি সহকারে অধিষ্ঠিত হলেন। কাহিনী যখন প্রথম বিপ্লব পর্যন্ত পৌঁছেছে তখন ২১ নং আয়াতে আল্লাহ্‌র স্বীয় অপার মহিমার বিচিত্র প্রকাশের প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে : وكذالك مكنا ليوسف فى الارض —এমনি করেই আমি ইউসুফকে মিসর ভূমিতে কায়েম করেছি।

এবার দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটবার পরও তেমনি করে ৬৫ নং আয়াতে অনুরূপ বলা হয়েছে : وكذالك مكنا ليوسف فى الارض —প্রথম উক্তিকালে যেহেতু, মিসরে হযরত ইউসুফের ঘটনাবলীর প্রারম্ভিক অবস্থা ছিল— তখনও তাঁর রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান লাভ বাকি ছিল, তাই সেখানে বলা হয়েছে : ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره "আমি তাকে 'তা'বিলুল আহাদীস' (১) বিষয়ক জ্ঞানদান করব। (মনে রেখো,) আল্লাহ্‌ স্বীয় অভীপ্সিত কার্যে অতি প্রবল।"

দ্বিতীয় উক্তিকালে যেহেতু কর্ম পরিসমাপ্তির পর তার প্রতিদান প্রকাশ করা হচ্ছে, এজন্য বলা হয়েছে : لا نضيع اجر المحسنين —ইহা এই জন্য হল যে, আমার বিধানে সৎকার্যের বীজ আদৌ বিফলে যায় না। নিশ্চয়ই তাতে ফল পাওয়া যায়।

এখন চিন্তা করুন ! পৃথিবীতে এর চাইতে আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে ? এই বন্দীর মুক্তির জন্য হঠাৎ একদিন কারাগারের দ্বার খুলে দে'য়া হয়। তাও কে খুলে দেন ? স্বয়ং মিসরের বাদশাহ ! আরও লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, তা কেন খুলে দিয়েছিলেন ?—একজন ইব্‌রানী বন্দীকে জেলখানা হতে বের করে সিংহাসনে বসাবার জন্য। হযরত ইউসুফের জন্য মিসরের জেলখানা আর সিংহাসনের মধ্যকার দূরত্ব যেন এক কদমের বেশী ছিল না। কারাগার হতে তিনি এক পা বাড়িয়েছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালকের আসনে গিয়ে আসীন হয়েছেন।

(১) সম্মুখে বাক্যাংশটির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (অনুবাদক)

তারপর প্রশ্ন জাগে যে, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপ্লবের পরিণাম দাঁড়িয়েছিল কী ?—তা বিগত ঘটনাসমূহ হতেও চমকপ্রদ। কোরআনের অতুলনীয় সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ ভাষায় মাত্র একটি বাক্যের মাধ্যমেই তা' প্রকাশ লাভ করেছে : وكذالك مكنا ليوسف فى الارض يتبوأ منها حيث يشاء —অর্থাৎ "পরম করুণাময় আল্লাহ্ বিচিত্ররূপে ইউসুফকে মিসর রাজ্য দান করেছেন ; তিনি যে কোন অংশকে ইচ্ছা স্বীয় কার্যে ব্যবহার করতে পারেন।" তিনি কেনান হতে স্বীয় বংশধরদের মিসরে আনয়ন করলেন এবং পরম আনন্দমুখর ভূমি মিসরের রাজধানীতে তাঁদের অতি সম্মানের সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মরুভূমির বেদুঈন জাতি, যাদের মিসর দেশে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হত—এখন তারাই মিসর রাজপুরীর অতি সম্মানিত বাসিন্দায় পরিণত হল। সেখানে তাদের বংশ বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। এমন কি চারশ' বৎসরান্তে যখন তারা সেখান হতে পুনরায় বেরিয়ে আসে, তখন তাদের জনসংখ্যা কয়েক লাখে পেঁৗছেছিল।

মিসরভূমি হতে বহিরাগত কয়েক লাখের সমষ্টি এই জাতি কাদের বংশোদ্ভূত ছিল ? —তারা ছিল সেই ছেলেটির বংশের—যিনি ক্রীতদাসরূপে মিসর ভূমিতে এসেছিলেন এবং পরে তথাকার শাসন পরিচালকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। আর ছিল তাঁর সেই একাদশ ভাইদেরই বংশধর, যাঁরা তাঁকে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দিলেন তাদেরকে তার পরিবর্তে জীবন আর জীবনের আশাতীত সফলতা।

এমনি করেই সেই "চুক্তি" বাস্তবায়নের বিচিত্র প্রকাশ হল—যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) আর তা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল হযরত ইসহাক ও ইয়াকুবকেও।

আত্মিক সত্য বনাম বৈষয়িক প্রগতি

এ ধারায় আলোচনাকালীন সর্বপ্রথমে আমাদের সম্মুখে আসে আত্মিক সত্য ও জড় উন্নতির তুলনা। হযরত ইয়াকুবের পরিবারগর্গ ছিলেন সত্য ধর্মের আমানতদার ; ঐশীবাণীর প্রাচুর্যে তাঁরা ছিলেন সমৃদ্ধ। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি ও পার্থিব জাঁকজমক বলতে তাদের কিছুই ছিল না। এমন কি শহুরে জীবন যাপনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। হযরত ইয়াকুবের বংশধররা সবাই ছিলেন মরুবাসী। মরুভূমিতে পশুচারণ এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রাই তাঁরা ছিলেন অভ্যস্ত।

পক্ষান্তরে মিসরের অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ উল্টো। সত্য ধর্মের আলো ও ঐশীবাণীর প্রাচুর্য হতে তারা বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন সর্বপ্রকার পার্থিব আয়-উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে তারা ছিল একেবারে শীর্ষস্থানীয়। তার রাজধানীর বাসিন্দারা লেখাপড়ায় পণ্ডিত ছিল। মিসরের ওমরাহ ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্র চালনা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিল পুরাদস্তুর বিজ্ঞ। তথাকার মন্দিরগুলোর যাদুকররা বস্তুতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখত এবং দার্শনিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অধ্যায়-গুলো শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকতেন। আজকের দিনে মিসরীয় পুরাতত্ত্ব এক পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে তা অধ্যয়ন করলে মনে হয়, মিসরের প্রাচীন নিদর্শনাবলীতে উল্লেখিত 'আবুনী' নামক ব্যক্তিই সম্ভবত সে

যুগের ফেরাউন ছিল। তার আমলে মিসরীয় সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

কিন্তু কালের চক্র যখন সেই মরুবাসী পরিবারেরই একজনকে মিসরে নিয়ে পৌঁছায়, তাও এরূপ অবস্থায় যা কোনরূপেই মান-মর্যাদা ও সফলতার উপায় হতে পারে না। তখন পরিণামটা দাঁড়িয়ে ছিল কি? —উপরোক্ত শক্তিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পরিশেষে সত্যধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা ও ঐশীবাণীর প্রাচুর্য সম-সাময়িক সর্বপ্রকার পার্থিব মান-মর্যাদাকে ম্লান করে দিল।

সত্যধর্মের প্রাচুর্য ছাড়া হযরত ইউসুফের নিকট আর কিছুই ছিল না। অপর দিকে মিসরীয়দের নিকট তা ছাড়া আর সব কিছুই ছিল। হযরত ইউসুফ ছিলেন সত্যধর্মের ভূষণে সজ্জিত, আর তারা ছিল সর্বপ্রকার পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। এতদসত্ত্বেও প্রতিটি প্রতিযোগিতার যুদ্ধে হযরত ইউসুফের নির্মল চরিত্র ও কর্মধারাই জয়ী হল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পার্থিব জাঁকজমক স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব হতে বিদায় নিতে হল। এমন কি রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার মুহূর্তেও বৈষয়িক উন্নতির কোন বস্তুই কাজে আসেনি। আগত ভীষণ বিপদ হতে রাজ্যকে রক্ষা করার সুরাহা করার জন্য সেই ইবরানী যুবকের নিকটই সমস্ত মিসরীয়দের মস্তক অবনত করতে হল।

হযরত ইউসুফ মিসর অধিপতির নিকট বলেছিলেন :

اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم "আমাকে রাজ্যের ধনাগার-গুলোয় নিয়োজিত করুন, আমি এসবের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারব। নিশ্চয়ই আমি সংরক্ষণ কার্যে নিপুণ।" বাস্তবে ইহাও ছিল সমসাময়িক জড় সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐশীবাণীর প্রাচুর্যের একটি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। অর্থাৎ আজ রাজ্যকে বাঁচাবার জন্য এরূপ একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি বিদ্যাবুদ্ধি কর্মকুশলতার সাথে সুষ্ঠুভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তৎকালীন মিসরীয় সুধী সমাজ এরূপ একজন উপযুক্ত লোক উপস্থাপন করতে সক্ষম হল না। সুবৃহৎ মিসর রাজধানী যা' এত সব জ্ঞানী বিজ্ঞানী, কর্মঠ ও যাদুকরদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল—এ ভার গ্রহণ করার মত স্বদেশীয় একজন লোকও সামনে এগিয়ে এল না। কিন্তু এ চরম মুহূর্তে হযরত ইউসুফের জবান হতে বেরিয়েছিল, "এ ভার গ্রহণ করার জন্য আমি প্রস্তুত। আমি এ

বিশাল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করব। কেননা, আমি রক্ষা করতে সক্ষম এবং এ সম্পর্কে আমার বেশ জ্ঞানও রয়েছে।"

সুসভ্য মিসরীয়রা কেনানের মরুবাসী যুবকের এ ঘোষণা শুনলো এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করল। নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াতটির অর্থও ইহাই।

و كذالك مكنا ليوسف فى الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء و لا نضيع اجر المحسنين ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون -

—(অর্থাৎ) আমি এমনি করেই ইউসুফকে সেই দেশে (মিসরে) সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, যেন সে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করে। আমি এইরূপেই যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, আর আমি সৎকর্মীদের পারিতোষিক বিনষ্ট করি না, এই পারিতোষিক ইহকালেও দান করে থাকি এবং যা'রা ঈমানদার ও পরহেযগার তাদের জন্য পরকালের পারিতোষিক পার্থিব পারিশ্রমিক হতে অধিক উত্তম।

কার্যধারা ও পরিণাম

☆

হযরত ইউসুফের ব্যাপারটি যেরূপ বিস্ময়কর অবস্হাতেই বিকশিত হয়ে থাক না কেন এবং যতই আশ্চর্যজনক বলেই মনে হোক না কেন,—কোরআন বলছেঃ তা ছিল আল্লাহর কর্মপদ্ধতিরই একটা স্বাভাবিক বিকাশ। সত্যদ্রষ্টা মানুষের এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। আগুন জ্বালালে যেমন গরম অনুভূত হয় অথবা পানি পান করলে যেমন তৃষ্ণা নিবারিত হয়, হযরত ইউসুফের ঘটনাবলীর বিকাশও হুবহু অনুরূপই। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি বস্তুর ন্যায় প্রতিটি কর্মেরও এক একটা বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং যখনই কোন বিশেষ কর্ম সংঘটিত হয় তার সাথে সাথে একটি বিশেষ পরিণামও প্রকাশ পায়। মর্ত্যভূমির আনাচে-কানাচে সর্বত্রই কার্যের সাথে কারণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ইউসুফের সাথে তাঁর ভ্রাতারা যা করেছিল তা মানব প্রকৃতি-সুলভ একটি কর্ম বৈ কিছুই ছিল না এবং তার একটি পরিণাম প্রকাশ পাওয়াও ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং তা প্রকাশ পেয়েছিল। অনুরূপ হযরত ইউসুফ তাঁর জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পড়ে যা কিছু করেছিলেন, সে সবও একটি বিশেষ চরিত্রের কতগুলো বিশেষ কর্ম ছিল মাত্র। কাজেই "যেমন কর্ম তেমন ফল হওয়া" অনিবার্য ; আর তা হয়েও ছিল। অনুরূপ এই ঘটনার প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন, আপনি দেখতে পাবেন,

প্রত্যেকটিই এক একটি বিশেষ কর্মে রত রয়েছে এবং প্রতিটি কর্ম এক একটা পরিণতির জন্ম দিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বীজ বপন করেছে ; তাই স্বীয় বীজানুযায়ী সবাই ফলও পেয়েছে। বস্তুত মানব ইতিহাসে ইহা কোনরূপ অসাধারণ ঘটনা নয়। বরং তা ছিল আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক কর্মধারারই অন্যতম। তাঁর এ স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি সর্বদাই আছে এবং সর্বদা থাকবেও।

যখনই এরূপ পাত্র ও অবস্থা বিশেষে অনুরূপ কার্যাবলীর বিকাশ হবে ; নিশ্চয়ই তখন সেরূপ পরিণাম বা ফলও প্রকাশ পাবে। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : سنة الله فى الذين خلوا من قبل لن تجد لسنة الله تبديلا —জীবন পদ্ধতির খোদাই বিধান অতীতেও এসেছিল, কিন্তু কখনো তাতে ব্যতিক্রম খুঁজে পাবে না।

তুমি নিঃসন্দেহে বলতে পার যে, ঘটনাগুলোর রকম সকম ছিল আশ্চর্য ধরনের এবং সেগুলোর পরিণামও ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু আল্লাহর কর্ম পদ্ধতির অপার মহিমা তো সব সময়ই এমনি করে চলছে। তিনি তাঁর কোন কার্যে বিস্ময়কর নন? তাঁর সব কিছুই তো হচ্ছে কার্যকরণ-সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তোমরাও তো ইচ্ছে করলে নিজ নিজ সুন্দর কার্যাবলী দ্বারা এ অলৌকিক ও বিস্ময়কর পরিণাম সৃষ্টি করতে পার। মূলত মুশকিল হচ্ছে তোমরা তা কখনো চাওই না, কাজেই আল্লাহ্‌র কর্ম পদ্ধতির বৈচিত্র্য লীলাও তোমাদের ভাগ্যে বিকশিত হয় না।

পৃথিবীতে হযরত ইউসুফের ঘটনাঅবশ্য একবারই ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর এ সুন্দর ও নির্মল কর্মধারা কেবলমাত্র একবারের জন্যই আসেনি। একথা বলা যায় যে, মিসরের সেই বাজার আজ আর বিরাজমান নেই, কিন্তু বিশ্ব বাজার তো আর কেউ বন্ধ করেনি যদি কেউ ইচ্ছা করে আজও হযরত ইউসুফের ন্যায় মহত্ব প্রদর্শন করে দেখুক, বিশ্বের জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন তাকে স্বাগতম জানায় কিনা?

এইজন্যই সূরা ইউসুফের একাধিক স্থানে এ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য এতে রয়েছে উদাহরণ, উপদেশ ও নিদর্শনাবলী। হযরত ইউসুফের কাহিনীর প্রারম্ভিক ঘোষণাতেই বলা হয়েছে :

لقد كان فى يوسف واخوته ايات للسائلين -

—"নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে রয়েছে সত্যসন্ধানীদের জন্য নিদর্শনাবলী।"

পুনঃ কাহিনীর সমাপ্তিও এ কথার উপরই করা হয়েছে।

لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب -

"নিশ্চয়ই তাদের কাহিনীতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ" অধিকন্তু, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করার পর পরই স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে:

وكذالك نجزى المحسنين الله لا يفلح الظالمون - الله من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين -

অর্থাৎ যা কিছু বিকশিত হয়েছে, তার সবই হল কর্মফল, তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিদান। তা' যখন কর্মেরই ফল, সর্বদাই তা' অনিবার্যরূপে প্রকাশ পাবে। যখন তা' প্রতিদান, অনিবার্যরূপেই শ্রমিকরা তা সর্বদা লাভ করবে।

হিংসা ও বিদ্বেষের ফল তাই, যা হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা পেয়েছিল।

হযরত ইউসুফ যা লাভ করেছিলেন, তা ছিল সত্যনিষ্ঠা ও সৎকর্মশীলতারই ফল।

সুন্দরতম ধৈর্যধারণ কক্ষণো সেই ফল থেকে মাহরুম হয় না, যা হযরত ইয়াকুবের ভাগ্যে জুটেছিল।

দুষ্কর্মের বীজ থেকে—

সর্বদা সে ফলই উৎপাদন হবে,

যা—

আযীয স্ত্রীর ভাগ্যে জুটেছিল।

মিথ্যে যতই ভেবে-চিন্তে সাজান গোছান হোক না কেন, তা কোনদিনই সত্যরূপে পরিগ্রহ করতে পারে না।

সত্য যতই প্রতিকূল অবস্থায় পড়ুক না কেন, কিন্তু তা কক্ষণো মিথ্যার স্তরে নেমে যায় না। বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায়ই সার্বভৌম শক্তি—সকলকেই তার সম্মুখে শির নত করতে হয়।

সৎকর্ম সকল অবস্থায়ই বিজয়ী সত্য, সবাইকে তার নিকট হার মানতে হয়।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

★

কাহিনীর মূল আদর্শ হল তার বিশেষ চরিত্রগুলো। তাই তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তম্মধ্যে সর্বাগ্রেই আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে হযরত ইয়াকুবের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব। তাঁর ভিতর শোক দুঃখের চরমতা রয়েছে, আবার সাথে সাথে বিশ্বাস এবং ধৈর্যও রয়েছে বেষ্টন ক'রে পুরো মাত্রায়। মনে হয়, প্রবল বেগে শোক দুঃখের ঝড় উঠেছে ; কিন্তু তা যেন ধৈর্য ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় প্রাচীরে বার বার বাধা পেয়ে ফিরে আসছে—শত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তার সাথে কুলিয়ে উঠছে না ; বলা বাহুল্য, এটাই হল সেই পবিত্র চরিত্রের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য।

স্বল্প পরিসরে বৃহৎ ভাবের অভিব্যক্তি হল কোরআনের অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য করুন! বাস্তব পরিস্থিতির এ জিনিস তিনটি কিরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতার সাথে কোরআনের ভাষায় বিকশিত হয়েছে। ব্যথা-বেদনার চরম বিকাশ মুহূর্তে মনে হয়, বিরহ অগ্নিশিখার ধূম্ররাশি যেন হযরত ইয়াকুবের চোখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছে। শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা গলে গিয়ে যেন আপাদমস্তক একটি দ্রবীভূত প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়েছে। (কোরআন বলে) ঃ

و تولى عنهم و قال يا اسفى على يوسف و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم -

অর্থাৎ, "হযরত ইয়াকুব স্বীয় ছেলেদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হায়, ইউসুফ! তোমার সম্পর্কে আমার আক্ষেপ! (আল্লাহ্ বলেন,) শোক-দুঃখ ও অনুতাপে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দু'চোখ শ্বেতকায় হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়ও তিনি আত্মসংবরণ করেছিলেন।" বলা বাহুল্য, এটা তাঁর এক দিনকার অবস্থা নয়, বরং বিচ্ছেদ-কালের প্রতি সকাল-সন্ধ্যাই তাঁর এভাবে অতিবাহিত হত। এরূপ ভয়াবহ অবস্থা দেখে ছেলেরা সবাই বলল,

قالوا تالله تفتئوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين -

অর্থাৎ, হে, আব্বাজান! আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের মনে হয়, আপনি অহরহ ইউসুফের স্মৃতি চিন্তায়ই লেগে থাকবেন, এরূপে হয় আপনি অকর্মণ্য হয়ে পড়বেন—মরেই যাবেন।

কিন্তু যখন তাঁর অন্তরে দৃঢ়তার দীপ্তি ভাস্বর হয়ে ওঠে তখনকার অবস্থা ছিল এই : পৃথিবীর সর্বপ্রকার উপায়ই শেষ উত্তর দিয়েছে, আশা ভরসার সর্বপ্রকার বাঁধনই টুটে গিয়েছে—সর্বদিক থেকেই আওয়াজ আসছে ইউসুফকে আর পাওয়ার আশা নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ধ্বনিত হচ্ছে—

انما اشكو بثى و حزنى الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون -

—"আমি তোমাদের নিকট কিছুই বলছিনে। স্বীয় শোক-দুঃখের জন্য আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই অভিযোগ করছি। আমি আল্লাহ্ হতে যা জানি তোমরা তা জান না।" اذهبوا فتحسسو من يوسف واخيه ولا تايئسوا من روح الله —"হে বৎসগণ! যাও, ইউসুফ এবং তার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর। কখনও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।" অথচ প্রতিটি মানুষ তা মিথ্যে বলছে এবং সবাই তাঁকে পাগল মনে করছে, কিন্তু তাঁর রসনা থেকে বেরুচ্ছে : انى لاجد ريح يوسف -"আমি যেন ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।"

আরও লক্ষ্য করুন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ছিল কতই না মযবুত! ইউসুফকের বিরহ বেদনার চরম মুহূর্তেও তাঁর মুখ হতে শুধু একথাই বেরিয়েছিল : بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون "এ (কখনও হতে পারে না) বরং তোমরা এসব নিজেদের

থেকে মিথ্যে বানিয়ে বলছ। আমি শুধু ধৈর্যই ধারণ করব। তোমরা যা বলছ এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্‌ই সাহায্য করুন।" পুনঃ যখন বনি ইয়ামিনের বিচ্ছেদের খবর শুনলেন, তখনও তাঁর মুখ হতে কেবলমাত্র ইহাই বেরিয়েছিল : — فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم (এবারও আমি পূর্বের) ন্যায় ধৈর্যই ধারণ করব। একান্ত আশা রাখি আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে এক সাথেই আমার কাছে পেঁাছে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী।"

হযরত ইউসুফের সাথে তাঁর ভ্রাতারা যা কিছু করেছেন এসব কিছু হতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বে'খবর ছিলেন না। তা' সত্ত্বেও কেবলমাত্র দু'টো কথা ছাড়া সমস্ত কাহিনীতে কোথাও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। একটি তো হল, بل سولت لكم انفسكم امرا আর দ্বিতীয়টি হল— হযরত ইউসুফের ভাইরা যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনি ইয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতার নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

هل امنكم عليه كما امنتكم على اخيه من قبل

—"এর পূর্বে তার ভাই (ইউসুফের) ব্যাপারে আমি তোমাদের যেরূপ বিশ্বাস করেছিলাম, এখন তাঁর সম্পর্কেও কি আমি তোমাদের সেরূপই বিশ্বাস করব ?" বাক্য দু'টোতে না আছে ভর্ৎসনার কঠোরতা, না রয়েছে অভিযোগের কোন প্রকার তীব্রতা। বরং অতি নম্র ও ভদ্রতার সাথে মূল ঘটনাটির এক অনুপম বর্ণনা দেয়া হয়েছে মাত্র।

প্রথম বাক্যটিতে বলা হয়েছে, তোমরা মুখে যা প্রকাশ করছ বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা হোক, তবুও ধৈর্য ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নেই। আর দ্বিতীয়টিতে কেবলমাত্র প্রথম ঘটনার পরিণামটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে কোন প্রকার অভিযোগ করা হয়নি। অর্থাৎ তোমরা আমাকে তোমাদের ওপর ভরসা করার জন্য বলছ ; কিন্তু এবারের ভরসাও কি প্রথম বারের ন্যায়ই করব, যার পরিণাম তোমাদের অজানা নেই।

শুধু তাই নয়, একটু চিন্তা করলে মনে হয়, প্রথম বাক্যটির প্রকাশ-ভংগী ভর্ৎসনার চাইতে দয়া ও অনুশোচনার ওপরই যেন অধিক প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে যেন সম্বোধিতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেন নি যে, তোমরা মিথ্যে বলছ অথবা ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছ। বরং তিনি বলেছেন : তোমাদের মনে

এরূপ একটি কথা গড়েছে যা তোমাদের ধারণায় খুবই সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা, 'তাসভীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কথা গড়ে দে'য়া, সুন্দর করে দেখিয়ে দে'য়া এবং তৎপ্রতি লোভ লালসা সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং হযরত ইয়াকুবের এই বাণীটি ছিল যেন একজন সমবেদনা জ্ঞাপনকারীর অনুশোচনা মাত্র। আফসোস ! তোমরা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির প্রতারণায় আটকে পড়ে গেছ—তার ফাঁকি হতে বাঁচতে পারলে না।

তারপর সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ প্রদানেরও স্বীকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা নফসের প্রতারণামূলক মোহে পড়ে গিয়েছ এবং মানুষ তার নফসের নিকটই পরাজিত হয়।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) হঠাৎ এরূপ অসহনীয় বিপদে পড়ে অন্য কোন কথা মনে না এনে কেবলমাত্র উপরোক্ত ধৈর্যপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন। এটা তাঁর অতুলনীয় ধৈর্যের কত বড় অভিব্যক্তি ! কোন ধৈর্যবান ব্যক্তির জন্য এতটুকু সম্ভব হতে পারে যে, তিনি কোন প্রকার আঘাত পাওয়ার পর, বড় জোর নিজের মুখে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন, কিন্তু ঠিক যে সময় চরম আঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হচ্ছেন এবং স্বীয় ব্যথিত হৃদয়ের সর্বপ্রকার জ্বলন্ত শিখা বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে আসছে, এরূপ নিদারুণ অবস্থায় নিজেকে সামলে রাখা তার জন্য মোটেও সম্ভব নয়। অতি গুরুগম্ভীর ও ধৈর্যশীল হৃদয়ও এরূপ পরিস্থিতিতে করুণ আর্তনাদে চীৎকার করে ওঠে। অতি কঠিন হতে কঠিনতর, অটল অনড় চরিত্রও তখন কেঁপে ওঠে, ঘাবড়ে যায়। কিন্তু হযরত ইয়াকুবের ধৈর্যের বাঁধ সেরূপ ছিল না আদৌ। এরূপ চরম মুহূর্তেও অতি ধৈর্য ও সহনশীলতার ভিতর দিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে স্রেফ উপরোক্ত বাক্যটি বেরিয়েছিল। যদ্দ্বারা মনে হয়, ব্যথা বেদনামূলক কোন ঘটনায়ই যেন তিনি পতিত হন নি।

এটাকেই কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে, 'সবরে জামালী'। বাহ্যত মনে হয় এ তিনটি জিনিস এক সময় একত্রিত হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ ধৈর্য ধারণ কালে বিরহ বেদনার কঠোরতা কেন ? আর যদি দৃঢ় বিশ্বাসই থাকত, তাহলে বিরহ বেদনা মিটে যাওয়া আবশ্যক ছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরকাররা এখানে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করেছেন এবং নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদর্শিতার

সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট। অধিকন্তু কোন প্রকার টানা-হেঁচড়ামূলক ব্যাখ্যারও দরকার হয় নি।

একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইয়াকুব সবিশেষ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আর ধৈর্যকে ঐ সময়ই ধৈর্য বলা হয়, যখন অধৈর্যের কারণসমূহ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কেউ যদি ব্যথা বেদনার শিকারই হল না, তাহলে কি করে বলা যায় যে, তার ভিতর তা সহ্য করার এবং উহঃ না করার শক্তি নিহিত রয়েছে ? সহনশীল তো একমাত্র তাঁকেই বলা যায়, যিনি সর্বদাই অগ্নিশিখার অসহনীয় জ্বালাপোড়া অনুভব করে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর মুখ হতে উহঃ শব্দটুকুও বোরোয় না।

যদি হযরত ইয়াকুবের ব্যথা-বেদনা এরূপ বিলোপ হয়ে যেত যে, তার জ্বলনটুকুও বাকি রয়নি অথবা রয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে মৃতপ্রায় অবস্থায়। তাহলে এটা তাঁর ধৈর্যধারণ বলা যেত না, বরং বলা যেত যে, তিনি চিন্তা ভাবনার প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হননি। বলাবাহুল্য, এরূপ অবস্থা হয়তো ফেরেশ্তাদের ন্যায় কোন প্রকার সৃষ্ট জীব অথবা যে সকল মানুষ একেবারেই অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে তাদের হতে পারে।

কিন্তু হযরত ইয়াকুব স্বর্গীয় ফেরেশ্তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মর্ত্যের মানুষ এবং সে হিসেবেই তাঁর নির্মল ও পবিত্র চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর পবিত্র আত্মা ছিল ধৈর্য ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তিনি ইউসুফের স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন একদিন এ বিয়োগান্ত নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবেই। তবুও হৃদয়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন মযবুর যার এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল, তিনি বৎসরাদির জন্য তাঁর কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন হযরত ইউসুফ সহি-সালামত রয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর বিচ্ছেদ বেদনার দহনকে তিনি সামলে উঠতে পারছিলেন না। বরং হযরত ইউসুফ যে ধরাপৃষ্ঠে জীবিত থেকে তাঁর কাছ হতে দূরে রয়েছেন, এ কল্পনাই নযন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনাকে আরও তীব্রতর করে তুলছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায় অতি মানবীয় রূপ চিত্রিত করা হয়নি। এখানেই এর গৌরব ও মাধুর্য নিহিত। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে একজন পূর্ণ ধৈর্যশীল ও মোমিন ব্যক্তির জীবনের চিত্র যা হতে পারে,

তাই এতে প্রকাশ পেয়েছে চমকপ্রদরূপে। হৃদয় বিরহ অনলে দাউ দাউ জ্বলছে, হাজার কোশেশ করলেও তা নির্বাপিত হবার নয়। কিন্তু সাথে সাথেই দেখা যায়, আত্মা, ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং মস্তিষ্কপূর্ণ ধৈর্যের শপথ করে ফেলেছে এবং ব্যথা-বেদনা ও চিন্তা ভাবনা যেন স্বস্থানেই পড়ে রয়েছে। যদি হৃদয় স্বীয় বিচলতায় কখনও শিথিলতা অবলম্বন না করতো, তা হলে মস্তিষ্ক নিজ ধৈর্য ও সহনশীলতাতে কক্ষণো প্রকম্পিত হতে পারতো না। কখন কখন এমন হত যে, হৃদয়ের অস্থিরতা সীমা অতিক্রম করে যেতো এবং বিদ্যুৎবেগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো يااسفى على يوسف —"হায় ; আক্ষেপ ইউসুফের জন্য।"

কিন্তু তাও যে বেরিয়ে আসতো, কার সম্মুখে ? তিনি হচ্ছেন সেই মহাশক্তিমান, যাঁর কাছে স্বীয় ব্যথা-বেদনা প্রকাশ না করাটাও হচ্ছে দাসত্ব বা আনুগত্যের পরিপন্থী।

(যেমন তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে) انما اشكوا بثى و حزنى الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون

—"স্বীয় শোক-দুঃখের জন্য আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই অভিযোগ করছি। আমি আল্লাহ্ হতে যা জানি তোমরা তা জান না।"

★

আলোচ্য কাহিনীতে হযরত ইয়াকুবের পরেই আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে হযরত ইউসুফের (আঃ) ব্যক্তিত্ব। মূলত তিনিই হলেন এ কাহিনীর নায়ক। এখানে পেঁছিলেই দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে এক নির্ভেজাল সত্যের আলোর বিকাশ। যে ভাবেই দেখুন, যে দিকেই তাকান আর যেখানেই দৃষ্টিপাত করুন তা আপনার সম্মুখে আসতেই থাকে। এটাই হল মানুষের চারিত্রিক মর্যাদা (character) আর তার সার্বিক বিজয়।

তাঁর চরিত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, মানব জীবনের বড় শক্তি হল চারিত্রিক মর্যাদা। যার ভেতর তা রয়েছে সে সর্বদাই সফলতা ও কামিয়াবী দেখতে পাবে। বিশ্বের সমস্ত বাধা বিপত্তিও যদি তার পথ রুখে দাঁড়ায়, তখনও সে স্বীয় পথ বের করে নিতে পারবেই। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্দুর, পাহাড়-পর্বতও যদি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবুও তার চলন্ত গতিকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। কোন প্রকার বিপদ আপদও তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। কোন শক্তি বা প্রতিকূল অবস্থাই পারবে না তাকে পরাজিত করতে। এমন কি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শক্তিও নয়। সর্বাবস্থায়ই তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে সফলতা—রয়েছে তার জন্য সর্বক্ষেত্রেই কামিয়াবী। সর্বপ্রকার শক্তির ওপর তারই হবে কর্তৃত্ব। শির উঁচু করে থাকার জন্যই কর্মময় জীবনের এ-পরীক্ষাগারে তার অবস্থান। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ও সবপ্রকার দুর্বলতা কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মাত্র সতর বৎসরের একটি বালককে পিতার স্নেহ-ক্রোড় হতে যবরদস্তী ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর সে এমন কতগুলো লোকের হাতে পড়ে, যারা সামান্য কয়েকটি টাকার বদলে তাকে বিক্রি করেছিল। পৃথিবীর লাখ লাখ মানব-চরিত এরূপ পরিস্থিতিতে কি করতো ? আর চিন্তা করুন, সে করেছিল কি ?

তার কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সে যেন একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় পরিস্থিতি পুরোপুরি বিবেচনা করতে পেরেছিল এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কোন অবস্থায়ই পড়ি না কেন তা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বরদাশ্ত করে নিতেই হবে এবং সে অনুযায়ীই আমাকে কাজ করে যেতে হবে। কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসরে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে পেশ করল। তিনিও নিজেকে উপস্থিত করলেন সেইরূপেই। আযীয মিসর তাঁকে গোলামরূপে কিনে নিলেন, তিনিও গোলামের ন্যায়ই তার খেদমত করতে আরম্ভ করলেন। একান্ত অনুগত বাধ্যগত একজন ক্রীতদাসের স্বীয় প্রভুর সাথে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তিনিও বিনা দ্বিধায় আযীয মিসরের সাথে অনুরূপ ব্যবহারই করতে লাগলেন। এতে তাঁর কোথাও বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ বা অনমনীয় ভাব প্রকাশ পেত না। এ আকস্মিক বিপদ, যা লাখ লাখ মানুষের আজীবনের অনুতাপ হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর কাছে যেন তা কোন বিপদই ছিল না।

পিতার স্নেহ-ক্রোড় হতে বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ অপরিচিত দেশে কোন এক অজানা লোকের ক্রীতদাস হয়ে পড়াটা হযরত ইউসুফের জন্য অনুরূপই ছিল—যেরূপ স্বেচ্ছায় কেউ স্বীয় জীবনের একটি আনন্দ উৎস পরিত্যাগ করে অন্য আর একটি গ্রহণ করে। না আছে অতীত অবস্থার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ, না বর্তমান অবস্থার জন্য বেদনা বোধ। তিনি না হলেন অতীত স্মরণে বেদনা ভারাক্রান্ত, না হলেন ভবিষ্যৎ আশংকায় কোনরূপ উদ্বিগ্ন। এ যেন এক দৃঢ়সংকল্প ও নিভীক মাঝি—কূল ছেড়ে অথৈ সমুদ্রে ভেসে পড়ায় যার কোন চিন্তা নেই, আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় বিচলিত হয় না যার মন, সকল প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে যে নির্ভয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার তরী এবং পরিশেষে সে পেঁছে যায় তার গন্তব্য উপকূলে।

হযরত ইউসুফকে লক্ষ্য করে যে সব তীর ছোঁড়া হয়েছে, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও কালের আবর্তন বিবর্তনের শরাশ্রয়ে এ সবের চাইতে তীক্ষ্ণতর

কোন তীর থাকতে পারে কি? কিন্তু তিনি স্বীয় বিশ্বাস ও ধৈর্যের মোকাবেলায় সে সবকে খড়ের কুটার ন্যায়ও মনে করেন নি। অধিকন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত এরূপ নির্মল ও নির্দোষ রয়ে গেলেন, যেন কোন প্রকার কালের চক্রান্তই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ভেবে দেখুন! যাঁরা পার্থিব আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝাপটা ও নানা প্রতিকূল অবস্থাতে স্বীয় পথ বের করতে চান, তাঁদের জন্য এ ঘটনায় কিরূপ অনুপম শিক্ষা রয়েছে—রয়েছে কিরূপ অতুলনীয় আদর্শ! হযরত ইউসুফ যদি তাঁর এসব বিপদ-আপদের শুরুতেই নিজের ভিতর এরূপ ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা না জন্মাতেন, তাহলে হয়তো তিনি সে স্থান পর্যন্ত পেঁাছতে সক্ষম নাও হতেন—যা পরিশেষে তাঁর গন্তব্য স্থানরূপে প্রমাণিত হল।

তারপর লক্ষ্য করুন! কালের চক্র কিভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা সৃষ্টি করে চলছিল, আর কিরূপে তাঁর অটল অনড় ও নির্মল চরিত্র বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে চলছিল।

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রেই আমাদের সম্মুখে এসে পড়ে আযীয মিসরের সাথে তাঁর ব্যাপারটি। হযরত ইউসুফকে তিনি একজন গোলাম হিসেবে কিনে এনেছিলেন। আর মিসরীয়রা যে ক্রীতদাসের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করত তা তথাকার প্রাচীন নির্দেশনাবলীই আমাদের সুন্দররূপে জানিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর অন্য সব প্রাচীন জাতি তাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে যেরূপ নিষ্ঠুর নির্দয় ও কঠিন প্রকৃতির ছিল, মিসরীয়রাও তা থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ স্বীয় সুন্দর মধুর চরিত্র দ্বারা আযীয মিসরকে বশ করে ফেলেছিলেন। আযীয মিসর তাঁর সাথে দাসসুলভ ব্যবহারের পরিবর্তে প্রভুর ন্যায় দেখতে লাগলেন এবং তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, 'اكرمى مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا'—"একে সযত্নে রেখো, হয়তো ভবিষ্যতে সে আমাদের উপকার করবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বলে গণ্য করব।"

এখন চিন্তা করুন! কিরূপে এ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল? তিনি কত বড় মহান চরিত্রের অধিকারী! কিরূপ হবে তাঁর সততা, কৃতজ্ঞতা ও আমানতদারী!—যে ব্যক্তি একজন মিসরীয় আমীরকে এরূপ প্রভাবিত করে ফেলেছিলেন যে, তিনি একজন ইবরানী ক্রীতদাসকে স্বীয় ছেলের ন্যায়

দেখতে লাগলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘর-বাড়ী ও সে এলাকার সর্বময় হোতা বানিয়ে দিলেন।

এরপরই আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় আযীয-পত্নীর ঘটনাটি। হযরত ইউসুফের প্রথমোক্ত পরীক্ষা ছিল তাঁর ধীশক্তি ও মস্তিষ্কের। আর এটা ছিল তার আবেগ ও প্রেরণার পরীক্ষা। ...মানুষের সব চাইতে বড় পরীক্ষাটা হল আবেগ ও উত্তেজনার দিকটাই। মানুষ সমুদ্রের পাহাড়সম বৃহৎ তরঙ্গমালা দেখেও বিমূঢ় হয় না, কঙ্করময় ভূমিতেও মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে না, আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোতেও তারা ভীত হয় না, হিংস্র জন্তুর সাথে লড়তে গিয়েও পিছ পা হয় না ; তীক্ষ্ম তরবারীর নীচেও তারা খেলাধূলা করে, কিন্তু আত্মার ক্ষীণতম প্রেরণা ও আবেগের আকর্ষণে কিছুতেই তারা ঠিক থাকতে পারে না, এ সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই তারা হেরে যায়। হযরত ইউসুফের নির্মল চরিত্র এক্ষেত্রেও প্রকম্পিত হয়নি। মানবাত্মার সর্ব বৃহৎ ফ্যাসাদও পারেনি তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমা রেখা আঁকতে।

পবিত্র কোরআনের অতুলনীয় বর্ণনা ভংগী স্রেফ গুটিকতেক শব্দ দ্বারাই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্রটা এঁকে দিয়েছে। যদি কোরআনের এ ইঙ্গিতগুলোর পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়েই একটা কাহিনীর রূপ ধারণ করবে।

আপনি কল্পনার চোখে একটু দেখুন ; সে মুহূর্তে আবেগ ক্রোধের ছিল কিরূপ অবস্থা এবং ইন্দ্রিয় লালসার এ নিমন্ত্রণ কিরূপ অগ্নি পরীক্ষা ও ধৈর্যহরণকারীরূপে উপস্থিত হয়েছিল? হযরত ইউসুফের ছিল তখন ভরা যৌবন এবং ব্যাপারটা তো প্রেম নিবেদনের নয়, তা ছিল অযাচিত প্রেম-ফাঁদে ফেলার দুরন্ত আকর্ষণের ব্যাপার ; চাওয়ার ব্যাপার নয়, অনাহূত পাওয়ার। তাও কি সাধারণ আবেদন নিবেদন ? তা ছিল একেবারে মত্ততা ও উম্মাদনায় পরিপূর্ণ। সব চাইতে বড় কথা হল, সে সময়টা ছিল সম্পূর্ণ বাধা বন্ধনহীন। দেখে ফেলবার মত কোন মানুষ বা বাধাযুক্ত কোন যবনিকাই ছিল না তখন সেখানে। এরূপ নাযুক মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখবার মত কোন লোক আছে কী? পবিত্রতা ও সাধুতার কোন্ পাহাড় আছে যে, এরূপ বিদ্যুৎ শিখার তাপ সহ্য করে নিতে পারে ?

কিন্তু—একটি পর্বত ছিল, যাকে এরূপ বিদ্যুৎ শিখাও হেলাতে পারেনি—তা ছিল হযরত ইউসুফের নির্মল চরিত্র। কোন অবস্থাতেই উহা প্রকম্পিত হয়নি। খোদ আযীয পত্নীর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, (এ ব্যাপারে তার চাইতে অধিক সাক্ষী আর কে হতে পারে?)... راودته عن نفسه فاستعصم —"আমিই ইউসুফকে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করার জন্য ফুসলিয়েছিলাম।" এরূপ অবস্থায়ও তিনি স্বীয় স্থান থেকে বিন্দুমাত্রও পদস্খলিত হননি। পবিত্রতার এ দুর্লংঘ্য পর্বতের দরুন তার ভেতর এতটুকুও কম্পন আসেনি।

অতঃপর লক্ষ্য করুন! আযীয-পত্নীর সে আনন্দ নিমন্ত্রণের জওয়াবে তাঁর মুখ হতে কি বেরিয়েছিল? معاذ الله انه ربي احسن مثوى —"তোমার স্বামী হচ্ছে আমার প্রভু। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন, বিশেষ মান সম্মানের সাথে তিনি আমাকে রেখেছেন।" তাঁর এ অমায়িক ব্যবহারের প্রতিদানে এরূপ অপকর্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতা কি করে সম্ভব হতে পারে? এরূপ কাজ আমার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। চিন্তা করুন! এটা কুকাজরূপে দেখানোর জন্য কত কথাই না বলা যেত, কিন্তু তাঁর ধারণা অন্য কোনও দিকে না গিয়ে কেবলমাত্র উপরোক্ত কথাগুলোর প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল এবং পবিত্র কোরআন সেগুলোই ব্যক্ত করেছে।

এ উক্তি হতে এ'টাই জানা গেল যে, তাঁর চরিত্রের মূল পদার্থটা এখানেই নিহিত। সততা, সাধুতা ও কর্তব্য পালন স্পৃহা যেন তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিল। ফলে সর্বক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম তাঁর এ দিকটাই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তারপর আমরা দেখতে পাই, অপবাদ ও ভর্ৎসনাকারীদের ব্যাপারটা। এ ফ্যাসাদটা কেবলমাত্র আযীয পত্নীর মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং হযরত ইউসুফের অনুপম ধৈর্য ও সহনশীলতার লুটতারাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য তৎকালীন মিসরের সমস্ত ফ্যাসাদ প্রকৃতির সুন্দরী যুবতীরাও সমবেত হয়েছিল।

কিন্তু এর পরিণামটাও কি বেরিয়েছিল?

قلن حاش لله - ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم -

—"তারা বলেছিল, আল্লাহ্‌র লীলা! এ ব্যক্তি তো মানুষ নয়! নিশ্চয়ই ইনি কোন মহান ফেরেশ্তা।"

অতঃপর লক্ষ্য করুন ! সততা ও সত্যবাদিতার পরীক্ষা অকস্মাৎ কিরূপ বেশ বদলিয়ে ফেলেছে ? মানুষ পৃথিবীতে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না—সেজন্য তাকে ভোগ করতে হয় নানারূপ শাস্তি। কিন্তু হযরত ইউসুফকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এইজন্য যে, তিনি কেন নিজেকে অপরাধ থেকে বিরত রাখছেন।

এ ধরণীতে মানুষ আনন্দময় জীবন খুঁজে বেড়ায়। যখন হাজার চেষ্টা করেও তা মেলে না, জবরদস্তী তা হাসিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, আর তখনই তাকে বরণ করতে হয় কারাবাস-শাস্তি। কিন্তু হযরত ইউসুফকে কারাবাস দেয়ার হুমকী দেয়া হচ্ছিল এজন্য যে, জীবনানন্দের সর্ব প্রকার মন ভুলানো সাজ সজ্জার সাথে তাঁকে নিমন্ত্রণ দেয়া সত্ত্বেও তিনি কেন তা গ্রহণ করছেন না—কেন তিন তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

এ'টা হল হযরত ইউসুফের নির্মল চরিত্রের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। এ'টাই হল সত্যপ্রেমের জ্বলন্ত প্রমাণ। এ'টাই হল সত্য নিষ্ঠার কর্ম বিধান। ঐটাই হল পূর্ণ ঈমানের কষ্টিপাথর। অন্যায় পথে জীবনের আরাম আয়েশ আর ন্যায়ের পথে জীবনের কঠোরতা, এ দুটো পথ যখন তাঁর সম্মুখে, তখন এ'টাই ছিল তাঁর দ্বিধাহীন ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত - السجن احب الى مما يدعوننى اليه—"যে দিকে আমাকে আহ্বান করা হচ্ছে তা থেকে জেলখানাই আমার জন্য শ্রেয়।"

আমাদের তফসীরকারগণ লেখেন, হযরত ইউসুফ স্বয়ং কয়েদখানার কথা বলাটাই ছিল তাঁর জন্য অশুভ লক্ষণ। তিনি যদি ইহা না বলতেন, তাহলে এ বিপদ কখনও আসত না।

আফসোস্ ! তাঁদের এ উক্তি কিরূপ সত্য বিস্মৃত ? হযরত ইউসুফের যে কথাটি ছিল তাঁর পবিত্রতাও মহান ব্যক্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ; সেটাই সত্যের সাথে অপরিচিতদের দৃষ্টিতে তাঁর বাকচাতুরতা হয়ে গেল। তাঁদের মতে অন্যায় ও পাপের ওপর জেল জীবনকে অগ্রাধিকার দান এবং সানন্দে তা গ্রহণের ইচ্ছা, এমন একটা ব্যাপার যা কখনও না—শুধু তিনি এইরূপ অশুভ কথা বলার দরুনই হয়েছিল। চিন্তা করুন। পবিত্র কোরআন কোথায় আর তার ব্যাখ্যাকাররা পৌঁছে গিয়েছেন 'কাহাতক'।

অতঃপর লক্ষ্য করুন ! হযরত ইউসুফের নির্মল ও পবিত্র চরিত্র তাঁর প্রভু আযীয-মিসরের প্রাসাদ, মান মর্যাদা ও ভাগ্যাকাশকে যেরূপ আলোকিত করেছিল, জেলখানার অন্ধকারাচ্ছন্ন শীর্ণকুটীরকেও করেছিল অনুরূপ দীপ্ত-আলোকোজ্জ্বল। কেননা, প্রদীপ যেখানেই যায়, আলোই দান করে এবং হীরে শাহী হীরেখানার পরিবর্তে কর্দমাক্ত স্থানে রাখলেও তার উজ্জ্বলতায় বিন্দুমাত্রও ক্ষীণতা প্রকাশ পায় না। বলা বাহুল্য, তওরাতের ব্যাখ্যায় আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, জেল সুপারিণ্টেন্-ডেন্টও হযরত ইউসুফের ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে তাঁরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তারপর দেখুন ! কারাজীবনেই সত্য ধর্ম প্রচার করার স্পৃহা তাঁর পবিত্র অন্তরে জেগে ওঠে ! নিজে যদিও সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি মিসর ভূমিতে তাঁর প্রচার অভিযান শুরু করেন নি। এবার সময় হল তাঁর ভিতর বংশানুক্রমিক নবুয়ত বিকাশের। সুতরাং তিনিও অকস্মাৎ স্বীয় অন্তরকে পেলেন ধর্ম প্রচার উত্তেজনায় পূর্ণ উদ্বোধিত। কিন্তু এখানে কে ছিল তাঁর এ প্রচারের সম্বোধিত ? স্রেফ, বিভিন্ন অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত তাঁর কয়েকজন সাথী ছিল সেখানে। চিন্তা করুন ! তিনি এ কাজের অন্য মুক্তির আর প্রতীক্ষা করলেন না। তাদের ভেতরই সত্য ধর্ম প্রচার আরম্ভ করে দিলেন। ফলে মিসরের জেলখানা সত্য ধর্ম প্রচার শিক্ষা-দীক্ষার এক বিদ্যালয়ে পরিণত হল।

তারপর লক্ষ্য করুন ! সত্য ধর্ম প্রচার ও প্রসারতার অবস্থা ছিল কিরূপ ? সে জেলে বাদশাহ্ দু'জন বিশেষ খেদমতগার কয়েদী আসে। তারা স্বপ্ন দেখে হযরত ইউসুফের কাছে তা ব্যক্ত করে। স্বপ্ন শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাদের একজনের মৃত্যু এবং অপরজনের মুক্তি অতি নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি ভাবলেন সুযোগের একপলও নষ্ট করা উচিত নয়। এদেরকেও সত্যধর্মের সাথে পরিচিত করান দরকার। হয়তো আশু মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সত্যের বীজ সাথে করে নিয়ে শাহী দরবারেও বপন করতে পারে। আর মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তিও সম্ভবত সত্য গ্রহণ করে ঈমানের সাথে পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, তিনি শোনামাত্র তাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা বলে দিলেন না—বরং তাদের এ আগ্রহ ও মনোযোগের সুযোগ নিয়ে অন্য কথা (ধর্মীয় কথা) বলা আরম্ভ করলেন।

انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخرة هم كافرون -

—"আমি সে সব লোকদের ধর্মমত ত্যাগ করেছি, যারা এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং পরকালের ওপরও নেই তাদের কোন বিশ্বাস।"

তাঁর চরিত্রের এ অধ্যায় হতে আমরা জানতে পারি, কিরূপে সত্য ধর্ম প্রচার দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং তা প্রচারকের আবেগ-উদ্যমতা কিরূপ অবস্থায় নিয়ে পেঁছিয় ? কারাজীবনও তাঁকে সত্যধর্ম প্রচার কার্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি। সে সময়ও তিনি কোনদিনই নিজের মুক্তির চিন্তা করেন নি। বরং সব সময়ই তিনি চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকতেন,—মানব জাতিকে কি করে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা হতে মুক্ত করা যায় ? যে কোন অবস্থায় যখনই তিনি ফুরসত পেতেন, উক্ত কার্যে লেগে যেতেন। দীর্ঘজীবী লোকদের হেদায়াত করার জন্য তিনি যেরূপ ব্যগ্র ছিলেন, যাদের মাথার ওপর মৃত্যুর তরবারী ঝুলছে তাদের হেদায়াত করার ব্যাপারেও তিনি অনুরূপই ধৈর্যহারা হয়ে যেতেন। কেননা, হেদায়াত পাওয়া প্রতিটি মানবের একটা স্বভাবজাত অধিকার এবং তা উভয় প্রকার লোকেরই যথাশীঘ্র পাওয়া উচিত।

অতঃপর লক্ষ্য করুন! কেবলমাত্র এখানেই এর পরিসমাপ্তি হয়নি, বরং তা যে পর্যন্ত পেঁছান সম্ভব, সেখান পর্যন্ত পোঁছিয়ে দেয়ার জন্য তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করতেন। যখনই তিনি জানতে পারলেন যে, তাদের একজন বাদশাহ্‌র সাকীদের সরদার এবং সে মুক্তি পেয়ে স্বীয় কার্যে বহাল হতে চলছে, সাথে সাথে তাঁর মস্তিষ্কে চাপল, —এ ব্যক্তি সর্বদাই বাদশাহ্‌র সম্মুখে থাকবে, তার দ্বারা সত্যের পয়গামটা বাদশাহ্‌র কর্ণগোচর করান অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে ! সুতরাং স্বপ্ন ব্যাখ্যান্তে তাকে তিনি বললেন, اذكرنى عند ربك—"তোমরা প্রভুর নিকট গিয়ে আমাকে স্মরণ করবে।" অর্থাৎ, আমার এ শিক্ষা ও আমন্ত্রণ মনে রেখো এবং সুযোগ মত বাদশাহ্‌র নিকট এগুলোর উল্লেখ করো। হয়তো এ সত্যের পয়গাম কাজ করতে পারে। সাধারণত হযরত ইউসুফের উক্ত বাণী হতে এ'টাই বুঝা যায় যে, তিনি স্বীয় মুক্তির জন্য তা বলেছিলেন। অর্থাৎ তোমার প্রভুর নিকট আমার মুক্তির জন্য সোপারিশ করো।

কিন্তু বর্ণনা-ভঙ্গী পরিদৃষ্টে তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও সত্য ধর্মের ব্যাপারেই কয়েদীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। স্বীয় সশ্রম কারাদণ্ড ও বিপদ সম্পর্কে যে তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যাটিই এখানে অধিক প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

বলা বাহুল্য, হযরত ইউসুফ কয়েদীদের স্বপ্ন শোনামাত্র কেন যে তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন না,—এর তাৎপর্যও পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু তফসীরকারগণ বলেন যে, প্রত্যাদেশ বাণীর অপেক্ষায়ই তিনি বিলম্ব করেছিলেন। যদি তাই হতো, তাহলে যা তিনি এখন পর্যন্তও জানতে পারেন নি, কি করে তা ব্যক্ত করার এরূপ জোর প্রতিশ্রুতি করেছিলেন : لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله—"তোমাদের খানা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা বলে দেব।"

অধিকন্তু, প্রত্যাদেশ-প্রাচুর্যে তো তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ ছিলই তারপরও ব্যাখ্যার জন্য প্রতীক্ষা করার কি প্রয়োজন ছিল? পরিষ্কার কথা হল, স্বেচ্ছায়ই তিনি বিলম্ব করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, স্বপ্ন ব্যাখ্যা শোনার তাগিদে এরা আমার প্রতি নিবিষ্ট হয়েছে। এ সুযোগে তাদের নিকট সত্য ধর্মের আমন্ত্রণ জানান উচিত। সুতরাং তিনি এর আলোচনা শুরু করে বললেন,

ذلكما مما علمني ربي - اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالآخرة هم كافرون - (٣٧)

অর্থাৎ—শীগ্‌গীরই আমি তোমাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি। কেননা, আমার প্রতিপালক আমাকে সে বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিদ্যা তোমাদের যাদুকর বা জ্যোতিষীদের বিদ্যার ন্যায় মনে করো না। আমার পথ তোমাদের পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তোমাদের পথের পথিক নই।

তারপর অনুরূপ কথায় কথায় তিনি সত্য ধর্মের আহ্বান জানাতে শুরু করলেন,

يا صاحبي السجن - ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار -

—"হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! বিভিন্ন উপাস্যই উত্তম, না এক আল্লাহ্—যিনি সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, তিনিই উত্তম?"

অতঃপর লক্ষ্য করুন ! আমাদের সম্মুখে হযরত ইউসুফের চারিত্রিক মর্যাদার কী এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠেছে। বাদশাহ্ স্বপ্ন দেখার পর সাকী সরদার যখন কারাগারে এসে তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করেছিল, এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রতিটি মানব কি করত ? পৃথিবীর যে সব নিরপরাধ কয়েদী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বৎসরের পর বৎসর বন্ধু-বান্ধবহীন ও অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তারাই বা এমতাবস্থায় কোন পথ বেছে নিত ? নিঃসন্দেহে সবাই তা ঐশী মদদ মনে করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হত এবং বলত, আমি এ সংকট মীমাংসা করে দিতে পারব। আমাকে এখান হতে বাদশাহ্ সমীপে যাওয়ার সুযোগ দে'য়া হোক।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, হযরত ইউসুফ এরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেন নি। তিনি উক্ত স্বপ্ন শোনামাত্রই তার ব্যাখ্যা বলে দিলেন। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে এ মূল্যবান কথাটা কিছুক্ষণ বিলম্ব করার এতটুকু ধারণাও তিনি করেন নি।

কেবলমাত্র জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হননি, অধিকন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান-দক্ষিণা দ্বারাও তিনি তাদের জামার প্রান্ত ভরে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বপ্ন দৃষ্ট এক আগাম বিপদবার্তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, তা থেকে নিরাপদে থাকার পথও তিনি তাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রশ্নটা ছিল বাদশাহ্র তরফ হতে, কিন্তু যিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কারাগারে। লক্ষ্য করুন ! স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দান-দক্ষিণায় রাজা-বাদশাহ্দের চাইতে কত অধিক উদার ছিলেন তিনি !

হযরত ইউসুফ কেন এরূপ করেছিলেন ? —এর পিছনে একমাত্র এ তাৎপর্যই নিহিত থাকতে পারে যে, পৃথিবী তাঁর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই করে থাকনা কেন, তিনি উহার খেদমত ও হেদায়াত ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারছিলেন না। তিনি যখন স্বপ্ন শুনে স্বীয় জ্ঞান ও অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা তার বিশ্লেষণ বুঝতে পেরেছিলেন, তখন মানব জাতি হতে স্বীয় জ্ঞান ও উপদেশ দয়ার্দ্রতাকে এক মুহূর্তের জন্যও ফিরিয়ে রাখতে পারছিলেন না। যে কেউ যখনই তাঁর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করবে, তাকে সাহায্য করা, তার ডাকে সাড়া দেয়া, আগ্রহ ভরে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া তাঁর ওপর ছিল একান্ত কর্তব্য এবং তিনি তা করেওছিলেন।

যদি তিনি তা না করতেন, তাহলে আদৌ সত্যের অধিনায়ক হতে পারতেন না। কারও বিপদকে স্বীয় মুক্তি ও স্বার্থোদ্ধারের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁর নিষ্কলঙ্ক সেবা স্পৃহার জন্য মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

তারপর বাদশাহ্ তাঁর সাক্ষাৎ-উৎসুক হলেন এবং তাঁর নিকট স্বীয় দূত পাঠালেন, এমতাবস্থায় হযরত ইউসুফের উচিত ছিল, সানন্দে এ খবরকে অভিনন্দন জানান। কেননা, আজ মুক্তি নিজেই এসে তাঁর সম্মুখে হাজির। তাও কিরূপ পরিস্থিতিতে? যাঁর সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন স্বয়ং বাদশাহ্। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হযরত ইউসুফের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তিনি কারাগার ত্যাগ করে বাদশাহ্কে সাক্ষাৎ দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অধিকন্তু বলে দিলেন, বাদশাহ্কে বলো গিয়ে প্রথমে আমার ব্যাপারটার অনুসন্ধান করা হোক।

এক্ষেত্রেও আমাদের মনে সে প্রশ্নটিই জাগে, পৃথিবীর প্রতিটি অত্যাচারিত বন্দী এরূপ পরিস্থিতিতে কি করত? আর সত্যের প্রতীক মহামানব করেছিলেন কী?

চিন্তা করুন! তাঁর চরিত্র কিরূপ মণি-মুক্তার সমাহারে রচিত হয়েছিল! আত্মবোধ ও আত্মমর্যাদা, অনুপম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সমভিব্যাহারে তাঁর শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় কিরূপ সৃষ্টি হয়েছিল? হযরত ইউসুফের এ প্রতীক্ষা ও অস্বীকারোক্তির মধ্যে চারিত্রিক বুদ্ধিমত্তার এক অভিনব দিক ছিল লুক্কায়িত। তিনি যেন অবস্থাদৃষ্টে মনে মনে বলছিলেন, কারামুক্তি নিঃসন্দেহে এক শুভ সংবাদ, কিন্তু আমার নির্দোষিতা প্রমাণ না হয়ে কেবলমাত্র বাদশাহ্র অনুগ্রহ ও ক্ষমার মুক্তি কি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে? আমি তো অপরাধী ছিলাম, কিন্তু বাদশাহ্ স্বপ্ন দেখার পর কেউই তার ব্যাখ্যা বলতে না পারায় আমি তা বলে দিয়েছি। সেজন্যই বাদশাহ্ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

সুতরাং ইহা হল বাদশাহর এহ্সান বা অনুগ্রহ। ইহা সত্য ও ন্যায় বিচার হলো না মোটেও। না, কখনও হতে পারে না।—এরূপ ক্ষমা প্রদর্শক মুক্তি আমি আদৌ গ্রহণ করতে পারিনা। আমি যদি অপরাধী হই, তাহলে আমাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেন আমাকে ক্ষমা করা হবে? আর যদি নিরপরাধী হই, তাহলে ইহা স্বীকার করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ

করার উপযুক্ত ছিলাম না বলে আমাকে মুক্তি দিতে হবে—কারও দয়ার পরবশে নয়।

আত্মমর্যাদা ও সত্য নির্ভরতার কত বড় নিদর্শন? কি অদ্ভুত চারিত্রিক দৃঢ়তা—যাতে কোন দিক থেকেই কোনরূপ নমনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় না। যেদিক থেকেই দৃষ্টিপাত করুন, তাঁর নির্মল বৈশিষ্ট্যগুলো সমভাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং এ সূর্যের আলোতে কোনদিনই ম্লানতা আসতে পারে না।

—তিনি জ্ঞানী আর তাঁর মাথায় রয়েছে আগুন! كأنه علم في رأسه نارا

আদপে হযরত ইউসুফের সৌন্দর্যের এটাই ছিল একটা বিশেষ কমনীয়তা যে তিনি প্রথম প্রদর্শনেই বাদশাহ্‌র অন্তর অধিকার করে ফেলেছিলেন। বাদশাহ্‌র উক্তিটি কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে : انك اليوم لدينا مكين امين—"আপনি আজ আমাদের নিকট অতিশয় সম্মানের পাত্র এবং অত্যন্ত বিশ্বাসীরূপে পরিগণিত।"

সর্বশেষে সে সুযোগটির কথাই চিন্তা করুন, যখন হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল—কিরূপ ভাই—? যারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত দাসরূপে পরদেশীদের নিকট বিক্রি করেছিল। তারা দাঁড়িয়েছিল কার সম্মুখে?—সেই মযলুমের সম্মুখে, যিনি আজ আর মযলুম বা অত্যাচারিত নন। বরং তিনি আজ সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং আকাল, দুর্দিনে মানুষের জীবন-উপায় দাতা। কি অপূর্ব সুযোগ ও মানবিক আত্মার প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্যমে ধৈর্য ধারণের কিরূপ সংকটময় অগ্নিপরীক্ষা ছিল সে সময়টা।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফের কর্মপদ্ধতি ছিল কিরূপ? আপনি কি বলতে পারেন, তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ উত্তেজনার এতটুকু ছায়া পর্যন্ত কোথাও পড়েছে? কেবল তাই নয়, বরং তখন তিনি ছিলেন স্বীয় ভ্রাতাদের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। প্রতিশোধ আর বদলা নেয়া তো হল অনেক দূরের কথা ; এমন কি ভাইদের মনে ব্যথাদায়ক একটি শব্দও তো তখন হযরত ইউসুফের মুখ হতে বেরোয়নি। পরিষ্কার পরিদৃষ্ট হচ্ছে লজ্জা, অপমান ও আঘাত তাঁর হৃদয়ে-ভাইদের চাইতে কোন অংশেই কম লাগেনি। অধিকন্তু ভ্রাতাদের সাক্ষাৎ প্রাপ্তির পর এ চিন্তায়ই তিনি অধীর ছিলেন যে, কি করে তিনি তাঁদের অন্তরে শান্তি ও স্থিরতার বায়ু বইয়ে দেবেন।

হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা যখন তৃতীয় বার মিসরে এসে নিজেদের অভাব অনটনের কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলল, مسنا واهلنا الضر "হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবার সকলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত।" অতঃপর সাহায্য প্রার্থনা করে আরও বলল, تصدق علينا - ان الله يجزى المتصدقين (৮৮) —"আমাদের কিছু খাদ্যশস্য সাহায্য করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাহায্যকারীদের পারিতোষিক দিয়ে থাকেন।" তখন তিনি ভালবাসা ও প্রেম উত্তেজনায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন একথাই ভাবছিলেন আমার ভাইরা আজ অভাব-অনটনের বিভীষিকায় পতিত ; আমি সম্মানিত আসনে আসীন আর তারা ভিখারীর মত সাহায্য প্রার্থনা করছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মন চাইল নিজেকে প্রকাশ করে দিতে।

তিনি ভাইদের লক্ষ্য করে বললেন, - هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه —"তোমাদের মনে আছে, ইউসুফ এবং তার ভাই-এর সঙ্গে তোমরা কি করেছিলে ?"

ইহা তো তিনি বললেন, অবশ্য এরূপ বলা ছাড়া সে সময় তাঁর অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভাইদের স্মরণ করিয়ে দেয়া, তিনি কি করে মিসর ভূমিতে পেঁছিলেন। সাথে সাথেই খেয়াল হল যে, সে ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দেয়া তো তাঁর ভাইদের জন্য সম্পূর্ণ লজ্জা ও অপমানজনক ব্যাপার। সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটা কথা বলে ফেললেন, যাতে তাঁদের ক্ষমা প্রার্থনার একটা সুরাহা হয়ে যায় এবং তাঁরা অপমান গ্লানি অনুভব না করে। অর্থাৎ তিনি বললেন, اذا انتم جاهلون (৭৯) —"ইহা সে সময়কার কথা যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ।" মানে লজ্জা বা অপমান বোধ করার এতে কিছুই নেই। কেননা, এ হচ্ছে তোমাদের অজ্ঞতার সময়ের কথা। পৃথিবীতে এরূপ কে আছে, যাদের অজ্ঞতার সময়ে কোন অঘটন ঘটেনি ?

এ কথা শোনা মাত্রই তাঁরা নিজেদের ভাই ইউসুফকে চিনে ফেলল এবং লজ্জা ও অপমানে শির নত করে বলল, تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين (৯৭) —"আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং নিঃসন্দেহে (বিগত কার্যকলাপে) আমরাই ছিলাম অপরাধী।"

অতঃপর হযরত ইউসুফকে দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন ; لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين —আজকে হচ্ছে বিচ্ছেদ অবসানে মিলনের লগন, ছিন্ন তন্ত্রী সংযোজনার দিন,—অভিযোগ ও ভৎর্সনার দিন আজ নয়। সর্ব প্রকার দুঃখ কষ্ট হতেই আজ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোন প্রকার কালিমাই আমার অন্তরে নেই। আল্লার নিকটও তোমাদের সমর্থনে প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন। কেননা তিনি হচ্ছেন মহান ক্ষমাশীল—তাঁর চাইতে অধিক ক্ষমা প্রদর্শনকারী আর কে আছে ?

তারপর যখন সময় এলো, তিনি আল্লার অনুগ্রহ ও কৃপায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অতীত ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করেন। লক্ষ্য করুন, এ ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত কালে তিনি কিরূপ তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। من بعد ان نزغ الشيطان بيني و بين اخوتي —"দুষ্ট বুদ্ধি প্রণয়নকারী শয়তান যখন আমার এবং আমার ভাইদের ভিতর বিরোধিতা সৃষ্টি করেছিল।" অর্থাৎ, প্রথমে তো তিনি উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে শয়তানের প্রতি অভিযোগ করেছেন, যাতে তাঁর ভাইরা সে ব্যাপারে দোষী না হয় ; —তিনি বলেছেন, এ ছিল বিতাড়িত শয়তানেরই চক্র। নতুবা আমার ভাইরা তা করতে যাবে কেন ? অতঃপর তিনি মূল ঘটনার অপরাধটা লাঘব করার জন্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা বিরোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারপর তিনি যা কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হচ্ছে এরূপ। "আমার এবং আমার ভাইদের ভিতর মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু ইহা তাঁদের অকারণ যুলুম-অত্যাচার ছিল না। এমন কোনও ব্যাপার ছিল যার দরুন পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হয় এবং সবাই বিরোধ সৃষ্টিকর কারণসমূহের সঙ্গে জড়িত ছিল। কেবলমাত্র এক পক্ষেরই দোষ ছিল না তাতে।

চিন্তা করুন ! যিনি শত্রুতা পোষণকারীদের সাথে এরূপ অমায়িক ব্যবহার ও উদারতা প্রদর্শন করতে পারেন, কত মহান ক্ষমাশীল তিনি, কি অদ্ভুত ছিল তাঁর সাহস ও নির্ভীকতা এবং চারিত্রিক মর্যাদার দিক থেকে তিনি কিরূপ উচ্চ আসনে আসীন ছিলেন ? আর যিনি এরূপ সর্বগুণে গুণান্বিত, তাঁর ভিতর নেই, এরূপ কোন গুণ থাকতে পারে কী ?

অসহায় অত্যাচারিত অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা সন্দেহাতীতরূপে এক শ্রেষ্ঠ কাজ, কিন্তু সহায়-সম্বল ও শক্তি-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যুলুম অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে কাউকে ক্ষমা করে দেয়া সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কাজ। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে : ولمن صبر وغفر - ان ذلك لمن عزم الامور - "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করেছে এবং ক্ষমা করে দিয়েছে, নিশ্চয়ই ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।" বলাবাহুল্য হযরত ইউসুফের মহান চরিত্রে উভয়টিই বিদ্যমান ছিল। অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় হাজার রকমের অত্যাচারের শিকার হয়েও তিনি 'উহ্' শব্দ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। আর সহায়-সম্বল অবস্থায় প্রতিশোধ নেবার কোন প্রকার কল্পনাও করেন নি তিনি। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাঁর জীবনের সুন্দর ও সর্বশ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সব শেষে আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত ইউসুফের দোয়াসমূহ। আদপে তা হচ্ছে একটা আলেখ্য পুস্তক যাতে তাঁর চরিত্রের এক একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়। সফলতা ও শ্রেষ্ঠতার একেবারে শীর্ষস্থানে পেঁছার পরও তাঁর অন্তর থেকে যে ধ্বনি বেরিয়েছিল তা ছিল এই : فاطر السموات والارض انت ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين - (١٠١)

অর্থাৎ—জীবনের সর্ব প্রকার সাফল্যের সার্থকতা—যার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা হতে হৃদয় কখনও বিরত থাকতে পারে না, তা হল এই যে, সত্যের পূর্ণ আনুগত্যের সাথেই জীবনের সমাপ্তি হোক এবং যারা তোমারই পথের অনুসারী নেক বান্দা, তাদের সাথে আমার মিলন হোক।

আযীয-পত্নী

হযরত ইউসুফের পর এ কাহিনীর প্রসিদ্ধ চরিত্র হল আযীয-মিসরের স্ত্রী। কারণ হযরত ইউসুফের মিসরীয় জীবননাট্যে সেই ছিল সর্ববৃহৎ অংশের অভিনেত্রী। আমরা দেখতে পাই তার ভিতর প্রেম ও কামনা-বাসনার বিভিন্ন স্তরগুলো একের পর এক বিকশিত হয়েছে। আল্-কোরআন একে কাহিনীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক এক অভিনব কায়দা ও ভাষার অনুপম অলংকাররাজির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং প্রতিবার উল্লেখ করার বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষণ করে দিয়েছে।

সর্বাগ্রে সে সময়টাই আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে, যখন উক্ত মহিলা হযরত ইউসুফকে আনন্দ-উপভোগ আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। কোরআন বলে, ولقد همت به وهم بها لولا ان را برهان ربه - —"সে মহিলাটির অন্তরে হযরত ইউসুফকে উপভোগ করার অটল ইচ্ছা বদ্ধমূল হয়েছিল ;—অপর দিকে তাঁর অন্তরেও সে মহিলার খেয়াল স্থান পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল—যদি না তিনি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেতেন।" অতঃপর যখন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে গেল এবং সে তার স্বামীকে সম্মুখেই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেল, নিজেকে তখন সে অত্যন্ত লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা বোধ করল। এমন কি তা সহ্য করতে না পেরে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিল। তাও কার ওপর ?—যাঁর প্রেম ও ভালবাসায় সে মত্ত ছিল, তাঁরই ওপর। قالت ماجزاء من اراد باهلك سؤ الا ان يسجن ا و عذاب اليم -

—"(স্বামীকে লক্ষ্য করে) সে বলল, যে তোমার স্ত্রীর সাথে অসৎ কর্মের ইচ্ছা করে, তার এ ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, সে কারাগারে প্রেরিত হবে অথবা অন্য কোনও কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।" এ উক্তি হতে প্রতীয়মান হয়, তখনও তার ভিতর প্রেম-ভালবাসার পূর্ণতা আসেনি, এবং তখনও ছিল তা একেবারে স্বাভাবিক পর্যায়ে। কেননা, তার মধ্যে তখন যদি পূর্ণতা এবং স্বীয় প্রেমাস্পদ সম্পর্কে কখনো এরূপ মিথ্যে অভিযোগ করতো না।

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। অবশ্য এবার সে বিদ্রূপকারিণী মহিলাদের সম্মুখে স্বীয় প্রেম-প্রীতির স্বীকারোক্তিতে আর কোন প্রকার লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেনি। কিন্তু সে বিশ্বের দরবারে তা স্বীকার করতে পারেনি। মহিলাদের সম্মুখে সে বলেছিল, انا راودته عن نفسه فاستعصم—"আমিই তার থেকে স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নির্দোষ রইল।"

বলাবাহুল্য, নিজের দৈহিক চাহিদার ঊর্ধ্বে স্বীয় প্রেমিকের মত্ ও পথকে স্থান দেয়ার মত পর্যায়ে গিয়ে তখনও আযীয-পত্মীর প্রেম-ভালবাসা পেঁৗছে ছিল না। তাই সে ধমক বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাঁকে বশে আনতে প্রয়াস পেয়েছিল। এটাই কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে,

ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين - (٣٢)

—অর্থাৎ, "অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও যদি সে আমার কথা পালন না করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।"

তারপর সে যখন প্রেম-প্রীতির সর্বপ্রকার স্তর ডিঙিয়ে একেবারে পূর্ণতায় গিয়ে পেঁৗছল, তখন লাজ-লজ্জা বা অপমানের কোন বালাই তার রইল না—রইল না শক্তি বলে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের কোনরূপ মান-অভিমান। যখনই সে শুনতে পেল, হযরত ইউসুফের ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন মহলে কিছু কথাবার্তা হচ্ছে, সে তখন নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিল, الئن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين (د)

—"এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধ যা ছিল আমারই, সে ছিল সম্পূর্ণ সত্যবাদী।"

এবার প্রেম ও ভালবাসার স্বীকারোক্তিতে সে কোন প্রকার লজ্জাই অনুভব করল না। এরপর তো সর্বপ্রকার অপমান-অসম্মান-বোধই তার থেকে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। এখন প্রেমাস্পদের পথে যা কিছুই আসত সবই প্রেমাস্পদ বলে মনে হত—সবই হয়ে গিয়েছিল প্রেমাস্পদ।

(১) এই আয়াতের পরবর্তী ذالك ليعلم انى لم اخنه بالغيب الخ এবং ومآ ابرئ نفسى الخ আয়াত দু'টি আযীয-স্ত্রীর কথার অবশিষ্ট অংশও হতে পারে এবং হযরত ইউসুফেরও হতে পারে। বর্ণনা পদ্ধতি দৃষ্টে বুঝা যায় প্রথমোক্তটিই প্রযোজ্য। আর কোন কোন দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় দ্বিতীয়টিই। সাধারণত তফসীরকারগণ দ্বিতীয়টির অনুকূলে মত দিয়েছেন; কিন্তু আমি প্রথমটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। কেননা উদ্ধৃতি-ধারায় স্পষ্টত এটাই প্রতীয়মান হয়।

প্রেম-ভালবাসার পক্কতা ও অপক্কতার এসব স্তরগুলো স্বভাবজাত এবং সাধারণ। যে কোন সময়, যে কোন পাত্রে বা ক্ষেত্রে প্রেমশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে, অপক্কতা, পক্কতা ও দগ্ধ হওয়া এ তিনটি অবস্থায় কোন না কোন একটি তাতে হবেই এবং তা না হয়ে পারেই না।

কুরআনে হযরত ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণনাসমূহের অনেক স্থানেই "তা'বিলুল-আহাদীস" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু শব্দটির প্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয়, এটা একটা বিদ্যা এবং আল্লাহ্ তা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল এটা দ্বারা কোন্ প্রকার ইলম বা বিদ্যা বুঝান হয়েছে ?

কোন কথার পরিণাম ও পরিণতিকে আরবীতে 'তা'বিল' বলা হয়, তাছাড়া ইহা কথাবার্তার অর্থ বা উদ্দেশ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, সূরায়ে ইউনুসের ৩৯ নং আয়াতের টীকায় শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে (১) । আর "আহাদীস" হাদীস শব্দের বহুবচন। ইহার আভিধানিক অর্থ হল, কথা। সুতরাং "তা'বিলুল আহাদীস" এর মানে দাঁড়ায়, কথাসমূহের অর্থ, উহার পরিণাম ও পরিণতি উপলব্ধি করার জ্ঞান। অর্থাৎ—কোন মানুষের ভিতর এরূপ জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার শক্তি সৃষ্টি হওয়া, যদ্বারা সে প্রতিটি কথার অর্থ ও পরিণতি বুঝতে সক্ষম হয়, নানা ব্যাপারের অতল তলে পেঁছে যেতে পারে, প্রয়োজনীয় কার্যা-বলীর রহস্য বুঝে নিতে পারে, প্রতিটি কথার নাড়িভুঁড়িও তার নিকট লুক্কায়িত না থাকে, প্রতিটি ঘটনার উদ্দেশ্যই সে আয়ত্ত করে নিতে পারে—কোন কথা যে কোনরূপ জড় অবস্থায়ই থাক না কেন, কিন্তু সে এমন চমকপ্রদরূপে তা বিশ্লেষণ করে দিতে সক্ষম হয়, যাতে সব কিছুই মীমাংসা হয়ে যায়—থাকে না কিছুই অমীমাংসিত।

হযরত ইউসুফের (আঃ) আবির্ভাব হয়েছিল 'কেনান' দেশের ধূলিধূসর মরুপ্রান্তরে। অধিকন্তু এরূপ এক গোত্রে তাঁর আগমন হয়, যারা কয়েক পুরুষ পূর্ব হতেই মরুভূমিতে যাযাবর জীবন যাপন করে আসছিল। কৈশোর হতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সে সমাজেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তথায় তিনি বাহ্যিক কোন শিক্ষা-দীক্ষারই সুযোগ পাননি এবং শহুরে জীবনের চাল-চলনের সাথেও তাঁর কোন দিন পরিচয় ঘটেনি। তিনি যখন শহুরে জীবনের সাথে পরিচিতই ছিলেন না, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, সমষ্টিগত জীবন অতিবাহন আদব-কায়দা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে তিনি আদৌ ওয়াকিফ ছিলেন না। আর তা কি করেই বা সম্ভব হতে পারে? রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ও সাংগঠনিক কার্যাবলীর মৃদু বায়ুও তো কোন দিন তাঁকে স্পর্শ করেনি।

অনেক সময় বংশগত পেশা ও চালচলন বাইরের চালচলন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। কিন্তু হযরত ইউসুফের বংশগত পেশা ছিল ধর্মীয় পৌরোহিত্য বা নবুয়তী। রাষ্ট্র চালনা বা শহুরে জীবন অতিবাহন তাঁর বংশগত ছিল না আদৌ। এমন কি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেনানে বসবাস আরম্ভ করার পর হতে তাঁর পরিবারের সাথে শহর এলাকার সর্বপ্রকার সংশ্রবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

এতদসত্ত্বেও কালের চক্র হযরত ইউসুফকে মিসরের ন্যায় উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পেঁৗছানোর পর, কেবলমাত্র তথাকার রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনার দিক থেকেই তিনি সুশাসনকর্তারূপে প্রমাণিত হননি, বরং তাঁর সফলতা ও তত্ত্বজ্ঞানই সে-দেশকে ভয়াবহ বিপদ ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাঁর সে অসাধারণ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে সমস্ত মিসরবাসী শির নত করেছে, হার মেনেছে ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এমন কি স্বয়ং বাদশাহ্কেও স্বীয় অযোগ্যতা ও অসামর্থ্য স্বীকার করতে হয়েছে। একজন লোক যিনি মাত্র কয়েক বৎসর হয় মরুভূমি হতে বেরিয়ে এসেছেন, কিরূপে তিনি প্রতিটি কথার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতাবান হয়ে গেলেন এবং কি করেই বা সমস্ত ব্যাপার, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সঠিক পথের দিশারী হয়ে গেলেন? নিশ্চয়ই তা একমাত্র মহান স্রষ্টারই লীলা বা দান। তবে এর নাম কি? —এরই নাম হচ্ছে

কুরআনে বর্ণিত "তা'বিলুল আহাদীস"।

বর্তমান বিশ্বে শিল্প, বিজ্ঞানের প্রসার এবং চারুকলার বিভিন্ন উদ্ভাবন আমাদের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সন্ধান দিয়েছে। আজ আমরা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশের জন্য অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এ ধরনের বাক-প্রবচন বা বাক-পদ্ধতি আদৌ নেই। অধিকন্তু তখনও আরবী ভাষা এরূপ পরিভাষার সাথে পরিচিত ছিল না। পবিত্র কুরআন এসব বিষয় প্রকাশের জন্য এরূপ এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা অতি স্বাভাবিক, সহজ ও সরল। অর্থাৎ সমস্ত কথায় তাৎপর্য, অর্থ ও পরিণতি সন্ধান করে নেয়ার জ্ঞান।

শিক্ষার সর্বপ্রকার অনুসন্ধান, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার সমস্ত পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা কিসের উদ্দেশ্যে চালানো হয়? এক মাত্র কথাবার্তার তাৎপর্য ও পরিণাম উপলব্ধি ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই ওসব কিছু করা হয়ে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কথাবার্তা যথাস্থানে প্রয়োগ করার শক্তি সঞ্চয়ই এর একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে সব ভাব প্রকাশ নিমিত্তে আমরা অগাধ গবেষণা চালিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছি; কুরআন সে সবের ছায়াও মাড়ায় না। বরং অতি সহজ, সরল ও স্বাভাবিকভাবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইহা তার বিস্ময়কর শব্দালংকারেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, তাই তফসীর-কারগণ বলেন, ইহা (তা'বিলুল আহাদীস) স্বপ্নের সত্য ব্যাখ্যা করার বিদ্যা ছিল। আমরা বলব, স্বপ্ন ব্যাখ্যাও যে তাতে রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য স্বপ্ন ব্যাখ্যাকেও নিশ্চিতরূপে ইহার অংশবিশেষ বলা চলে। কিন্তু তা দ্বারা যে কেবলমাত্র স্বপ্ন ব্যাখ্যাই বুঝান হয়েছে একথা বলা সঠিক বলে মনে হয় না।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, স্বপ্নের বাস্তব ব্যাখ্যা বা রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া নবুয়তীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীরই অন্যতম এবং প্রত্যেক নবী বা ধর্মযাজকই প্রত্যাদেশবাণীর মারফত স্বপ্নরহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকেন। খোদ হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও নয়নের পুতুল হযরত ইউসুফের স্বপ্ন শোনা মাত্রই উহার বাস্তবতা জানতে পেরেছিলেন। হযরত দ্যানিয়াল ও ওযায়র (আঃ) এর স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় কাহিনীও আমরা অবগত আছি। যদি

তাই হতো তবে ("তা'বিলুল আহাদীস") কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ইহা নবীদের কর্ম ও বৈশিষ্ট্যাবলীরই অন্যতম। আর তিনি যখন নবী হতে চলেছেন, তখন অত্যাবশ্যকরূপে এ ধরনের সব যোগ্যতাও লাভ করছিলেন।

বলা বাহুল্য, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর স্বপ্ন শুনে বলেছিলেন, ঃ—

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل -

—"আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে মনোনীত করবেন, 'তা'বীলুল আহাদীস' জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং তিনি তোমার পূর্ব-পুরুষদের উপর যেরূপ স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেছেন, অনুরূপ ইয়াকুবের বংশধর ও তোমার উপরও নিয়ামত পূর্ণ করবেন।"

হযরত ইয়াকুবের উপরোক্ত বাণীতে "মনোনীত করা" শব্দটি দ্বারা বিশেষ সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করার কথাই বুঝান হয়েছে। আর 'অনুগ্রহ সম্পূর্ণ' বাক্যাংশ দ্বারা নবুয়ত দান করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং 'তা'বিলুল আহাদীস' শিক্ষা অন্য কোন তৃতীয় বস্তু হতে হবে। ইহা যদি স্বপ্ন ব্যাখ্যা জ্ঞানই হ'ত তা হলে নবুয়ত দান সুসংবাদেই তো তা এসে গিয়েছিল, সবিশেষরূপে পৃথক করে তিনি আর উল্লেখ করতেন না।

তা ছাড়া, একজন নবীর জন্য স্বপ্ন ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতা, এমন বড় ব্যাপার নয় যে, ইহা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ বা দানরূপে পরিগণিত হবে।

অতঃপর হযরত ইউসুফের কাহিনীর তিনটি স্থানে 'তা'বীলুল আহাদীস' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব স্থান সম্পর্কে চিন্তা করলে, এ সত্যটি আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এর চাইতে অধিক ব্যাখ্যা 'আল-বয়ান' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

আত্মীয় ও আত্মীয়-পত্নী

আযীয-মিসর ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে তফসীরকারগণ বিশেষ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা মযবুর হয়ে উহার যথার্থতা হতে অনেক দূরদূরান্তর ব্যাখ্যাসমূহের আশ্রয় নিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, স্ত্রীর চরিত্র দোষ আযীয-মিসরের নিকট ধরা পড়ে গিয়েছিল, তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর স্ত্রীই এই কুচক্রের মূল, তার কারসাজিতেই এসব কিছু...। তিনি স্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم - "নিঃসন্দেহে ইহা তোমাদের স্ত্রীলোকদের কুচক্রান্তেরই অন্যতম, নিশ্চয়ই তোমাদের চক্রান্ত অতিশয় ভয়ানক।"

কিন্তু এর পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি ব্যাপারটাকে সেরূপ বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নি। তিনি স্ত্রীকে কেবলমাত্র বলেছিলেন, استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين - "স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, তুমিই ছিলে তাতে অপরাধী।" তারপর স্ত্রীর উপর কোনরূপ কঠোরতা অবলম্বন না করে পূর্বানুরূপ স্বাধীন ও মুক্তাবস্থায়ই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, শহরের বিশিষ্ট মহিলাদের আমন্ত্রণ করা, আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন এবং তাতে হযরত ইউসুফকে উপস্থিত করা, এইসব কিছুর ভিতর উহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাই। কেননা, এসব কিছুই সংঘটিত হয়েছিল আযীয-মিসর ব্যাপারটি সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়ার পর এবং

তাঁর উপরোক্ত বাণী ব্যক্ত হওয়ার পর। অধিকন্তু আযীয স্ত্রী হযরত ইউসুফকে কারাবাসের ভীতি প্রদর্শন এবং তা কার্যকরী করা হতেও তার অধিকার, হস্তক্ষেপ ক্ষমতা ও স্বাধীনতার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা যায়।

বরং স্ত্রীর আপত্তিকর ও অসৎ চলনে এরূপ বিশেষ কোন দোষ ছিল না যে, "স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও" এ বাক্যের অধিক কোনরূপ কঠোরতা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আযীয-মিসরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। তা কিরূপে সম্ভব! একজন নিতান্ত উচ্চ মর্যাদাবান লোক স্বীয় স্ত্রীর এরূপ জঘন্য ও আপত্তিকর ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে উৎকণ্ঠা ও অনুভূতি-হীন হয়ে পড়বে ?

যদি আমাদের তফসীরকারদের সম্মুখে তৎকালীন মিসরীয় সমাজের (Society) বিস্তারিত পটভূমিকা মওজুদ থাকতো, তা হলে উক্ত ব্যাপারে তাঁরা আদৌ আশ্চর্য হতেন না বা কোনরূপ মুশকিলেও পড়তেন না। তাঁরা দু' হাজার আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার মিসরীয় সমাজ ও তার চরিত্র-বোধকে তাঁদের সমসাময়িক সমাজ ও চারিত্রিক অনুভূতির উপর আরোপ করেছেন এবং তদনুযায়ী ব্যাপারটার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। (এ'টাই তাঁদের নিয়ে গিয়েছে মূল হতে অনেক দূরান্তরে—সৃষ্টি করেছে বিশেষ জটিলতা।)

এই সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য আমাদের সম্মুখে দু'টি উপায় রয়েছে।

এ দু'টি উপায়ের একটি সরাসরি সে যুগের এবং অপরটি পরবর্তী বিভিন্ন আমলের সহিত সম্পর্কযুক্ত। প্রথমটি সেকালের মিসরীয় পৌরাণিক তত্ত্বাবলী (Egyptology) হতে সংগৃহীত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হয়েছে খৃষ্ট-অব্দের কিছুকাল পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত কিছু সংখ্যক প্রাচীন লিপি ও দলিল হতে। উক্ত প্রমাণ উপায় দু'টি এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্র কুরআন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার যে প্রতিচ্ছবি অংকন করেছে, বাস্তবেও তা হুবহু অনুরূপই ছিল।

অর্থাৎ—আমীর-ওমরা শ্রেণীর সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক অবস্থা সাধারণ লোকদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তাদের মহিলারা স্ব স্ব কাজ-কর্ম, চাল-চলন তথা সর্বক্ষেত্রেই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা পুরুষদের আয়ত্তে বা কব্জায় থাকাটা আদৌ পছন্দ করতো না। পারিবারিক

জীবনে তাদেরই ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি। চারিত্রিক দিক থেকে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে সৎ অসৎ ও পবিত্র-অপবিত্র কথাটাই তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—তাদের মধ্যে এর বালাই ছিল না। পুরুষের এসব জেনে শুনেও নিরুপায় হয়ে সহ্য করে যেত(১)। বরং এ হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ আব্দের মিসরীয় সমাজ ব্যবস্থা হুবহু অনুরূপ ছিল যা আমরা এক হাজার বৎসর পর রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে দেখতে পাই। এমন কি স্বয়ং জুলিয়াস সিজারের স্ত্রীদের জীবনেও আমরা তার নমুনা দেখতে পাই। তাদের ষোল আনা জীবনই ছিল সন্দেহপূর্ণ। তাই তাদের জীবনধারা নিয়ে কেউ কোন সমালোচনারই প্রয়োজন মনে করতো না। তাদের বলা হত সকল সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে।

মূলত গ্রীক ও রোম সমাজব্যবস্থা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এদিক দিয়েও মিসর এবং ব্যাবিলনের পদাংক অনুসরণ করে চলেছিল।

মিসরের এ নগ্নতা সর্বকালেই বিদ্যমান ছিল। আযীয-পত্নীর সময় হতে আরম্ভ করে ক্লিওপেট্রা (Cleopetra) পর্যন্ত কেবলমাত্র নারীদের শোভা সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং পারিবারিক জীবনে নির্ভীকতা, নগ্নতা ও বল্গাহীন স্বাধীনতার জন্যও তা ছিল বিশ্ববিখ্যাত।

স্বয়ং এ কাহিনীতে তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। আযীয-মিসরের নিকট যখন স্ত্রীর এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে যে কথা বলেছিলেন, চিন্তা করুন তা ছিল কি ?—

তিনি বলেছিলেন ঃ انه من كيدكن ان كيدكن عظيم-

"হাঁ, বুঝতে পারলাম, তোমাদের মেয়েলোকদেরই এ চক্রান্ত। তোমাদের চক্রান্ত অতিশয় ভয়ানক।" আযীয-মিসরের এ উক্তি হতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, সে সময় নারীদের সম্পর্কে সমাজের সাধারণ ধারণা কিরূপ ছিল ? তারা ভাল করেই জানতো, সে সময় প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় নারীরা ছিল একাকার। তাদের ছলচাতুরী ও ধূর্তামি হতে নিরাপদে থাকা তখন এক অসাধারণ ব্যাপার ছিল। অন্যথায় এক্ষেত্রে আযীয-মিসরের জবান হতে নিঃসংকোচে এরূপ নিরুদ্বিগ্ন উক্তি আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ ব্যাপারে চক্রান্ত বা প্রতারণা যা কিছুই করে থাক না কেন, তা করে

(১) জড় সভ্যতার তীর্থভূমি পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল যা চলেছে।—(অনুবাদক)

ছিল একমাত্র তার স্ত্রীই। নারী সমাজ তাতে দায়ী নয়। কিন্তু যেহেতু সে সময়কার সামাজিক জীবনে তা ছিল সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাই একজন মহিলার ঘটনা উপলক্ষেই নিসংকোচে তাঁর মুখ হতে বেরিয়েছিল, "তোমাদের সবার একই অবস্থা, তোমাদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা হতে আল্লাহ নিরাপদে রাখুন।"

এরপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা থেকেও জানা যায়, সে সময় তথাকার নারী সমাজের নৈতিক চরিত্র ছিল কিরূপ? শহরের উঁচু পরিবারের যুবতীরা যখন শুনতে পেল, একজন ইব্‌রানী গোলাম এরূপ সুন্দর ও সুদর্শন যে, আযীয স্ত্রী তাকে ভোগ করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগেছে। এমন কি সে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু গোলামটি কিছুতেই ফাঁদে পড়ছে না। তারা তখন তাকে দেখার জন্য অত্যধিক আগ্রহান্বিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল, অতঃপর যখন নিমন্ত্রণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হল এবং তাঁকে সেখানে ডাকা হল, তখন অতি কমসংখ্যক মেয়েলোকই ছিল, যারা নিজেদের মন-মুগ্ধকর ও যৌন আবেদনপূর্ণ প্রেমের ফুল-শরে তাঁকে ঘায়েল করতে চায়নি।

একথা সুস্পষ্ট যে নারীদের এরূপ নগ্নতা ও নির্লজ্জতা এবং খোলা মহ্‌ফিলে নিংসকোচে প্রেম নিবেদন করা, কেবলমাত্র এরূপ মুহূর্তেই সম্ভব হয়, যখন লক্ষ্ণৌর পরিভাষায়, 'বিলাস ব্যসন'টা যুগের ফেশন হয়ে দাঁড়ায় এবং সৌখীন নারীরা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সুতরাং আযীয-মিসরের কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, তা ছিল মিসরের একজন আমীরের কর্মপদ্ধতি এবং তাঁর থেকে এ'টাই হওয়ার ছিল।

তিনি নিজ স্ত্রীর প্রতি দোষারোপ করে বলেন ঃ অপরাধ তোমারই ছিল। ইউসুফকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যা হওয়ার হয়ে গেছে, এ নিয়ে আর বাড়া-বাড়ি করো না। তখন তিনি এর অধিক কিছু করতে পারতেন না এবং সমসাময়িক অনুভূতি বিবেচনায় এর চাইতে অধিক কিছু তাঁর নিকট হতে আশাও করার ছিল না।

নারী ছলনাময়ী

আযীয-মিসর -- ان كيدكن عظيم "তোমাদের চক্রান্ত অতিশয় ভয়ানক" বাক্যটির মাধ্যমে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, স্পষ্টতই তা ছিল স্বীয় শহরের তৎকালীন মহিলাদের সম্পর্কে। সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজ সম্পর্কে তা ছিল না আদৌ।

তাছাড়া এতে যা-ই বলা হয়ে থাক না কেন, হচ্ছে আযীয-মিসরের কথা। তা তো আর কুরআনের সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, অনেক লোক এ'টাকে নারী-পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে কুরআনের সিদ্ধান্ত বলা শুরু করেছেন। তাঁদের নিকট নারী জাতি পুরুষদের তুলনায় অধিক ধূর্ত ও প্রতারক। অপবিত্রতা ও সতীত্ব নষ্টের সর্ব প্রকার পথ বের করার ব্যাপারে নারীরাই হচ্ছে অধিক বুদ্ধিমতী, অধিক চালাক ও অধিক হুঁশিয়ার।

সাধারণত আমাদের তফসীরকারগণ আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। অতঃপর নিজেদের চিরাচরিত স্বভাবের প্রভাবে যুক্তি-তর্কের দূর প্রান্তে গিয়ে হারিয়ে গেছেন—(খুঁজেও পাওয়া যায়নি তাঁদের কোন সন্ধান)।

প্রথমত তাঁরা আয়াতটিকে নারীজাতি সম্পর্কে কুরআনের একটা নির্বিশেষ ও সম্পূর্ণ নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেন। অতঃপর এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত অপ্রতিভ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। আয়াতটি হল : ان كيد الشيطان كان ضعيفا অর্থাৎ, আয়াতটিতে তো শয়তানের ধূর্তামিকে দুর্বল বলা হয়েছে। তাহলে, নারীদের চক্রান্ত

বা প্রতারণা বড় হল কি করে? তারপর চলে যান তাঁরা নানারূপে ব্যাখ্যার দূর দূরান্ত প্রান্তে। যতটুকু সম্ভব শেষ সীমা পর্যন্ত না গিয়ে আর নিবৃত্ত হন না। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হন যে নারীদের ধূর্তামি বা প্রবঞ্চনা শয়তানের চক্রান্তের চাইতেও ভয়ানক। কেননা, কুরআনের প্রথমোক্ত আয়াতটি যে এ ব্যাপারে একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আবার কারো কারো সূক্ষ্ম বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি তাতে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হয় না। তাঁরা বলেন : না, সর্বক্ষেত্রে এ'টা প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র যৌনক্ষেত্রেই তা সম্ভব। এ ক্ষেত্রেই পুরুষ নারীদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

বস্তুত এ'টা কুরআনের নির্দেশ নয় আদৌ। অধিকন্তু আযীয-মিসরের উক্তিও এরূপ পর্যায়ে নয়, যা থেকে নির্বিশেষ আর ব্যাপকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। তর্ক-রহস্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এই ইমারতটার আগাগোড়া সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

সন্দেহাতীতরূপে বলা যায়, পুরুষেরা আত্ম-স্বার্থের অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা সর্বদাই নারী সমাজ সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ফয়সলা করে আসছে। কিন্তু এ'টা কুরআনের ফয়সলা বা সিদ্ধান্ত মোটেই নয়। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন নারী পুরুষকে সমানরূপে উল্লেখ করেছে। স্বভাব, প্রকৃষ্টতা ও গুণাবলীর দিক থেকে কুরআন উভয়ের ভিতর কোনরূপ প্রভেদ বা পার্থক্য করে না।

সূরা নিসা'র যে অংশে পারিবারিক জীবনের আদেশ-নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয়ই নিজ নিজ পথে সমান অধিকার রাখে এবং উন্মুক্ত রাখা হয়েছে জ্ঞান ও উৎকর্ষতার দ্বার উভয়ের জন্য একই রূপে। যেমন বলা হয়েছে للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شئ عليما -(٤-٣٢) —"পুরুষেরা যা করেছে সে অনুপাতেই তাদের প্রতিফল পাবে আর নারীরাও পাবে স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ীই তাদের প্রতিফলন বা প্রতিদান। (সর্বদা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তিনি সব কিছুর সম্পর্কেই জ্ঞাত।"

আরও লক্ষ্য করুন, যেমনি করে কুরআনে সৎ পুরুষদের গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে, অনুরূপ সতী মেয়েলোকদের গুণাবলীও প্রকাশ করা হয়েছে। আবার অসৎ পুরুষ ও অসতী মেয়েলোকদের কুৎসা প্রকাশেও অনুরূপ পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোনরূপ প্রভেদ বা পার্থক্য দেখান হয়নি। পুরুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ـ "তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী, ইবাদতকারী, (আল্লাহ্র) প্রশংসাকারী এবং (তাঁর পথে) ভ্রমণকারী নামাযে দেহ অবনতকারী, সাষ্টাঙ্গে প্রণামকারী, মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশকারী ও মন্দ কাজ হতে বিরতকারী এবং আল্লাহ্ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তারা তার প্রতি দৃষ্টি রাখে।"

অনুরূপ মেয়েদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে, "তারা ইসলামে অনুবর্তিনী, বিশ্বাসিনী, অল্পে সন্তুষ্ট ক্ষমাপ্রার্থিনী, উপাসনকারিণী, আল্লাহ্র পথে ভ্রমণকারিণী।"

কুরআনের যে স্থানে মুনাফেকদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও নারী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পুরুষদের উল্লেখ করা হয়নি। বরং উভয় সম্প্রদায়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ـ —"মুনাফেক নারী-পুরুষদের পরস্পর পরস্পরকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজের নিষেধ করে।"

মোমেন বা ধর্মবিশ্বাসীদের বেলায়ও শুধু পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়নি ; সেখানেও নারী সমাজের উল্লেখ করা হয়েছে, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ـ —ধর্মবিশ্বাসী "নারী-পুরুষরা একে অপরের সহায়তাকারী, তারা ভাল কাজের নির্দেশ করে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে।"

নারী-পুরুষকে এরূপ চারিত্রিক সাম্যের বন্ধনে জড়ানটা আল্লাহ্র সাধারণ বা স্বভাবজাত নীতি। আপনারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন, তিনি নারী-পুরুষকে একই কাতারে দাঁড় করিয়েছেন, একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং একইরূপে তাদের উল্লেখ ও সম্ভাষণ করেছেন।

যেমন, তিনি বলেছেন, ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .... اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ۔

—অর্থাৎ "পুরুষদের মধ্যে যেরূপ মুসলমান ও ঈমানদার লোক রয়েছে ; অনুরূপ নারীদের মধ্যেও মুসলমান ও ঈমানদার মহিলা রয়েছে। পুরুষদের ভিতর যেরূপ অল্পে সন্তুষ্ট পুরুষ রয়েছে সেরূপ মেয়েলোকদের ভিতরও রয়েছে অল্পে সন্তুষ্ট মহিলা। পুরুষদের ভিতর যেরূপ সত্যবাদী রয়েছে অনুরূপ নারীদের মধ্যেও সত্যবাদিনী মেয়েলোক রয়েছে। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি রয়েছে এবং যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে বা ডাকে এরূপ লোক যেমন করে পুরুষদের ভিতর রয়েছে, অনুরূপ রয়েছে মহিলাদের ভিতরও। আবার পুরুষদের মধ্যে যেমন এরূপ নির্মল চরিত্রবান লোক রয়েছে, যারা রিপুর অভিলাষ, কামনা-বাসনা ও প্রতারণার প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে, অনুরূপ মহিলাদের ভিতরও রয়েছে, যারা তা থেকে আত্মরক্ষায় মোটেই অমনযোগী নয়।"

চিন্তা করুন, উপরোক্ত গুণাবলীতে নারী পুরুষের ভিতর কোথাও কোন প্রকার প্রভেদ নেই, কোনরূপ পার্থক্য নেই—নেই কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্বেই কোনরূপ অসাম্যতা। যে কুরআন নারী-পুরুষের নৈতিক বা চারিত্রিক সমতার প্রতি এরূপ স্বীকৃতি দিয়েছে, কি করে সম্ভব হতে পারে যে, তারই ফয়সলা হবে, নারী সমাজ পুরুষদের তুলনায় অধিক অসৎচরিত্রা বা চরিত্রহীনা—পুরুষেরা হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র ও নির্মল আর নারীরা হচ্ছে অসৎ চরিত্রা, বিলাসিনী ও প্রতারক ?

কুরআন—ব্যাখ্যার ইতিহাসে এটা কিরূপ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আমাদের তফসীরকারগণ একজন মিসরীয় পৌত্তলিকের উক্তিকে আল্লাহ্‌র ফরমান বলে মনে করেছেন। এমন কি তাঁরা এটাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে বলেন, নারীকুলের নৈতিক অবনতি ও চরিত্রহীনতা সম্পর্কে ইহাই হল পবিত্র কুরআনের স্বতঃসিদ্ধ ফয়সলা।

প্রকৃতপক্ষে যদি পবিত্রতা ও নির্মলতার দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে সর্বপ্রকার পশুত্বসুলভ আত্মগরিমা ও ধূর্তামি পুরুষদের মধ্যেই রয়েছে। আর নারীদের ভিতর রয়েছে সর্বপ্রকার ফেরেশ্‌তাসুলভ সততা, সাধুতা ও পবিত্রতাসমূহ। পুরুষদের দ্বারাই

অনেক ক্ষেত্রে নারীদের সতীত্ব ও নির্মলতা বিপন্ন হয়ে ওঠে। তারা চায় নারী সমাজকেও তাদের ন্যায় পশু বানিয়ে ফেলতে। তারা সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সর্বপ্রকার প্রবঞ্চনা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়, আর সরল-মনা নারীদের এক এক করে যতসব বদমা'শীর রাস্তাগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে ছাড়ে। এরপর নারীরা সে সব পথে পা বাড়ান মাত্রই পুরুষেরা মুখ ফিরিয়ে বলতে আরম্ভ করে, নারীরাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধূর্ত ও প্রতা-রক ; নারীদের দুষ্টামিই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিকর। আদপে পুরুষরাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারক। প্রথমে পুরুষরাই প্রতারণা ও কলা-কৌশলে নারীদেরকে নিজেদের কুমতলব চরিতার্থ করার হাতিয়ার বানায়, আর তারা যখন বিপথে পা বাড়ায় তখন নিজেরা সাজে সাধু, সৎ ও পবিত্র এবং যত সব অপবিত্রতার বোঝা চাপিয়ে দেয় সে সব নির্দোষ ও নিরপরাধ মেয়ে লোকদের মাথায়।

এ নিখিল বিশ্বে কোন মেয়ে লোকই খারাপ বা অসতী হতে পারে না যদি পুরুষে তাকে মযবুর না করে। মেয়েলোকের দুর্নাম বা কুৎসা যে কোন অবস্থায়ই হউক না কেন, যদি আপনি অনুসন্ধান করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ওটার গভীরত্বে সর্বদাই পুরুষদের হাত রয়েছে। আর যদি তা আপনার পরিদৃষ্ট না হয়, তা হলে এমন সব কুৎসা নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি-গোচর হবে, যার সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরুষরাই।

তাওরাতে উদ্ধৃত হয়েছে মা হাওয়া আদমকে (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের প্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই জন্য মানব জাতির নাফরমানীর প্রথম পদক্ষেপ নারীর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং ইহুদী-খৃষ্টান-দের বিশ্বাস হল, নারী জাতির সৃষ্টিতেই পুরুষদের চাইতে অধিক দুষ্টামি ও নাফরমানি নিহিত রয়েছে এবং তারাই পুরুষদের বিপথগামী করে থাকে। কিন্তু পবিত্র কুরআন এ ঘটনাকে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং কুরআনের প্রত্যেক স্থানেই ব্যাপারটির সাথে উভয়কেই জড়িত করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা সমভাবে উভয়ের জন্যই দেয়া হয়েছিল। যেমন, কুরআনে উভয়ের প্রতি আদেশ বর্তিয়ে বলা হয়েছে, - ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

—"তোমরা এ বৃক্ষটির নিকটে যেও না, অন্যথায় তোমরা নিজেরাই তোমা-দের অনিষ্ট ডেকে আনবে।"

৭—

পদস্খলন যে হয়েছিল তাও একই রূপে উভয় থেকেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه - (৩৮ : ২) —"শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিল এবং ইহা তাদের (স্বর্গ হতে) বের হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল।" অর্থাৎ এ পদস্খলনে উভয়ের সমান অংশ ছিল—কারও প্রভাব কম-বেশী ছিল না তাতে।

স্থূল কথা, স্মরণ রাখা উচিত যে তফসীকারগণ সূরা ইউসুফের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করেন, তা একেবারে ভিত্তিহীন, এর সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। কুরআনে নারী সমাজের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে সব উদ্ধৃতি রয়েছে তাতে এরূপ কোন কিছুর উল্লেখ নেই। যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, নারী পুরুষ থেকে নীচ অথবা অপবিত্রতার পথে অধিক অগ্রণী, চতুর বা ধূর্ত।

আযীয-স্ত্রীর নাম

যোলায়খা—?

তাওরাতে উদ্ধৃত হয়েছে মিসরের যে আমীর হযরত ইউসুফকে খরিদ করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল 'ফুতীফার' (জন্ম ৩৭-৩৬), কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নাম যে কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের তফসীরকারগণ লিখেছেন, তার নাম 'যোলায়খা' ছিল। জানি না তাঁরা ইহা কোথায় অবগত হয়েছেন? যা হউক এ নামের নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু তফসীরকারদের এ বর্ণনা সত্য যে, তৎকালীন মিসরীয় শাসকেরা ছিল 'আমালেকা' বংশের। এই আমালেকাদেরই মিসরীয় ইতিহাসে 'হিকসোস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের পূর্ব পরিচয় দানে বলা হয়েছে, তারা রাখাল সম্প্রদায় ছিল।

প্রশ্ন জাগে তারা কোথা হতে মিসরে এসেছিল? অধুনা অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, তারা আরব থেকে এসেছিল। মূলত তারা ছিল আরবের 'আরেবা' গোত্রসমূহের একটা শাখা। প্রাচীন কির্বতি এবং আরবী ভাষার সাদৃশ্যতা তাদের আরবী হওয়ার অনুকূলে একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত ইউসুফের পরলোক গমন

অন্তিম অনুরোধ

স্বদেশ পথে আমার হাড়গুলো সাথে করে নিয়ে যাবে
এবং সেগুলো আমার পূর্ব পুরুষদের সমাধি
পাশে দাফন করে রাখবে।

তওরাত গ্রন্থে জানা যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ) সারা জীবন মিসরের স্বাধীন শাসক হিসেবে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে, তিনি তাঁর ভাই ও সন্তান-সন্ততিদের ডেকে বললেন, "তোমাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের (আঃ) সাথে ওয়াদা করেছেন। এক সময়, আসবে তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের পুনরায় 'কেনান-ভূমিতে' ফিরিয়ে নেবেন। সে সময় আমার হাড়-গুলো সাথে করে নিয়ে যাবে এবং তথায় আমার পূর্ব পুরুষদের নিকট দাফন করে রাখবে।" বস্তুত মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা মৃতদেহে সুগন্ধি দ্রব্যাদি লাগিয়ে একটা বাক্সে রেখে দিয়েছিল (জন্ম, ৫ : ২৪)

সম্ভবত মিসরীয় প্রথানুযায়ী হযরত ইউসুফের (আঃ) মৃত দেহ মমী করে রাখা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যেই হয়তো তাতে খোশবু লাগান হয়েছিল। চার'শ বছর পর হযরত মুসা (আঃ) আবির্ভূত হন এবং তিনি বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর হতে বেরোবার সময় হযরত ইউসুফের (আঃ) মৃতদেহ সাথে করে নিয়ে যান। এরূপে হযরত ইউসুফের (আঃ) অন্তিম বাণী পালন করা হয়।